Vol. II | Issue 4

বাংলা বিজ্ঞান কথা

এপ্রিল ২০২৪

ক্ষনিকের ঝলক

অ্যাটোসেকেন্ড এত ক্ষুদ্র সময় যে আমরা কিছুতেই সেটা কল্পনা করতে পারবো না। এক সেকেন্ডকে যদি একশো কোটি ভাগে ভাগ করি এবং প্রতিটি ভাগকে আবার একশো কোটি ভাগ করি তবে তা হবে অ্যাটোসেকেন্ড। এত ক্ষুদ্র সময় দরকার হয়েছিল পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনের গতিবিধি লক্ষ করার জন্য।

- দ্য মিরর স্ক্রিপ্ট
- জাতীয় বিজ্ঞান দিবস উদযাপন
- বিশ্ব আবহাওয়া দিবস: আবহাওয়া বিজ্ঞানের উপলব্ধি
- বসন্ত বৌরি
- সহজ পথে পিথাগোরীয় ত্রয়ীর হদিশ

Shanti Foundation

RAMAKRISHNA MISSION

সূচীপত্র

বিজ্ঞান সংবাদ ৪

ক্ষণিকের ঝলক ৬
রাজকুমার রায়চৌধুরী

দ্য মিরর স্ক্রিপ্ট ১০
অমিতেশ ব্যানার্জী

জাতীয় বিজ্ঞান দিবস উদযাপন ১৬
মানস মৌলিক

বিশ্ব আবহাওয়া দিবস: আবহাওয়া বিজ্ঞানের উপলব্ধি ১৮
নকুল পারাশর

বসন্ত বৌরি ২০
তাপস কুমার দত্ত

সহজ পথে পিথাগোরীয় ত্রয়ীর হদিশ (প্রথম পর্ব) ২২
ভূপতি চক্রবর্তী

জাতীয় বিজ্ঞান দিবসে আরো কিছু অনুষ্ঠানের ঝলক ২৬

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জগতের এপ্রিল মাসের কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ২৮

এপ্রিলে জন্মগ্রহণ করেছেন যে বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা ৩০

গ্রন্থ সমালোচনা ৩২

অক্ষয় কুমার দত্তের মূর্তি স্থাপনা

উনবিংশ শতকের বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সাংবাদিক, প্রবন্ধকার, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয় কুমার দত্ত ছিলেন বিজ্ঞানমনস্ক ও যুক্তিবাদী। একপ্রকার বলা যায় অক্ষয় কুমার ও তার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার হাত ধরেই বাংলায় বিজ্ঞান সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চার সূত্রপাত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর সখ্যতা ও যৌথ কর্মোদ্যোগ ছিল চোখে পড়ার মতো। বিজ্ঞানের পরিভাষা তৈরিতেও তিনি ছিলেন অগ্রণী। 'জাড্যতা', 'ভরকেন্দ্র', 'তারিৎ' শব্দগুলো তাঁরই সৃষ্টি। জীবদ্দশাতেই পেয়েছেন 'লেখক চূড়ামণি' উপাধি। তবে জন্মদ্বিশতবর্ষ পার হয়ে গেলেও অক্ষয় কুমার দত্তের কোনও মূর্তি কোথাও ছিল না। এবার সেই অভাবই পূরণ করা হল। মঙ্গলবার, 19শে মার্চ 2024 তারিখে পশ্চিম মেদিনীপুরের দাশপুর-2 ব্লকের গোমকপোতা গুণধর বিদ্যামন্দির প্রাঙ্গনে স্থাপিত হলো তার প্রথম আবক্ষ মূর্তি। মুর্তিটি উন্মোচন করেন আকাশবাণীর প্রোগ্রাম এক্সিকিউটিভ এবং বিশিষ্ট লোকবিজ্ঞান প্রচারক ড. মানস প্রতিম দাস। একই সঙ্গে বাংলার আরো দুই প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিরও আবক্ষ মূর্তি স্থাপিত হয়। এরা হলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ও শহিদ ক্ষুদিরাম বসু। মূর্তি দুটি উন্মোচন করেন যথাক্রমে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক ডা. মধুসূদন পাল এবং প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সিদ্ধার্থ জোয়ারদার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি বিনয় রঞ্জন অধিকারী, প্রধান শিক্ষক ও মূর্তি স্থাপনের রূপকার শ্রী সুব্রত কুমার বুরাই এবং অন্যান্য বিশিষ্টরা। অনুষ্ঠানে জাতীয় জীবনে এই তিন মনীষীর অবদান, তাদের ভাবাদর্শ ও তাদের প্রদর্শিত পথে চলার প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা হয়।

সম্পাদকীয়

স্থিতিস্থাপকতার সংরক্ষণ: বিশ্ব আবহাওয়া দিবস এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস

এপ্রিলের আগমনের সাথে সাথে মনে আসে দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিন—বিশ্ব আবহাওয়া দিবস এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস। যদিও আপাতদৃষ্টিতে এই দুটি দিনের গুরুত্ব স্বতন্ত্র, কিন্তু কোথাও যেন দিন দুটির মধ্যে এক গভীর যোগসূত্র বর্তমান। 'বিজ্ঞান কথা'র এই এপ্রিল সংখ্যায় আমরা বিশ্ব আবহাওয়া দিবসকে সামনে রেখে আবহাওয়াবিজ্ঞানের আলোচনা করলাম, পরবর্তীতে জনস্বাস্থ ও স্বাস্থ্যের ওপর আবহাওয়ার প্রভাব সম্পর্কেও আলোচনা করবো।

বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (WMO) প্রতিষ্ঠার স্মরণে 23শে মার্চ পালিত হল বিশ্ব আবহাওয়া দিবস। আমাদের গ্রহকে সুরক্ষিত করার ক্ষেত্রে আবহাওয়াবিদ্যার মুখ্য ভূমিকা তুলে ধরার লক্ষে এই দিনটির গুরুত্ব অসীম। এই বছরের থিম, "Weather-Ready, Climate-Smart," আমাদের ক্রমবর্ধমান জলবায়ু সংকটের যুগে গভীরভাবে প্রাসঙ্গিক।

আবহাওয়াবিদ্যা আমাদের জন্য প্রকৃতির প্রহরী হিসাবে কাজ করে, আবহাওয়ার ধরণ, জলবায়ু প্রবণতা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করে। ক্রমবর্ধমান জলবায়ু পরিবর্তনের আশংকার সাথে সাথে স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। চরম প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে শুরু করে বৃষ্টিপাতের ধরণ পরিবর্তন এমনকি বিশ্বব্যাপী উষ্ণায়ন এখন মানব সভ্যতাকে সংকটের সম্মুখীন করেছে। আসুন আমরা জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা বাড়ানোর জন্য আবহাওয়াবিদদের উপদিষ্ট উদ্ভাবনী কৌশলগুলি অবলম্বন করার চেষ্টা করি। উন্নত পূর্বাভাস কৌশল থেকে শুরু করে আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থার সহায়তা নিয়ে আমরা বাসযোগ্য বিশ্বের পুনর্নির্মাণে ব্রতী হই।

আগামী 7ই এপ্রিল পালিত হবে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস। জনস্বাস্থ্য এবং বিশ্বকল্যাণের অগ্রাধিকার দেওয়ার শপথ নেওয়ার দিন। বিশ্বব্যাপী মহামারীর পটভূমিতে, এই বছরের থিম, "আমার স্বাস্থ আমার অধিকার" COVID-19 পরবর্তী বিশ্বে অসাম্যের মুখোমুখি দাঁড়ানোর চেতনা। জনস্বাস্থ্য আমাদের পরিবেশের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। বায়ু ও পেয় জলের গুণমান, বর্জ নিষ্কাশন এবং জলবায়ুর পরিবর্তনশীলতা মানব স্বাস্থ্যের উপর গভীর প্রভাব ফেলে। আমরা যখন পরিবেশগত নির্ধারকগুলির জটিল আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ করি, তখন পরিবেশগত এবং জনস্বাস্থ্যের উদ্বেগকে সামগ্রিকভাবে মোকাবেলা করার পন্থা অবলম্বন করা আমাদের জন্য অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

আসুন, আমরা একটি সুস্থ গ্রহ এবং সুস্থ সমাজের মধ্যে মিথোজীবী সম্পর্ক গড়ে তুলতে পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জনস্বাস্থ্য রক্ষায় উদ্যোগী হই। পরিবেশ-বান্ধব স্বাস্থ্যসেবা অনুশীলন থেকে শুরু করে প্রকৃতি-বান্ধব পদক্ষেপের মধ্যে দিয়ে আমরা এমন অসংখ্য উপায় খুঁজে বার করি যেখানে পরিবেশ সংরক্ষণ জনস্বাস্থ্যের মানককে শক্তিশালী করতে পারে।

বিশ্ব আবহাওয়া দিবস এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উদযাপনের মাধ্যমে আসুন আমাদের বিশ্বের ও সমাজের আন্তঃসংযোগকে উপলব্ধি করি এবং সম্মিলিত পদক্ষেপের অপরিহার্যতা স্বীকার করি। আবহাওয়া এবং স্বাস্থ্যের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলার মাধ্যমে আমরা আরও টেকসই এবং স্থিতিস্থাপক ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে চলার সংকল্প গ্রহণ করি।

আসুন আমরা সম্মিলিতভাবে বিজ্ঞান, উদ্ভাবন এবং সহযোগিতার শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আমাদের গ্রহকে পুনর্নির্মাণ করতে এবং এর সমস্ত বাসিন্দাদের অস্তিত্ব রক্ষা করার লক্ষে উদ্যোগী হই। আমরা বিশ্ব আবহাওয়া দিবস এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের চেতনাকে আত্মস্থ করে আগামী প্রজন্মের জন্য একটি স্বাস্থ্যকর, আরও টেকসই বিশ্বের বিকাশে ব্রতী হই।

এ বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করে যাবো আমি,
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।

বাংলা বিজ্ঞান কথা-র সকল পাঠককে জানাই বাংলা নববর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা।

ডঃ নকুল পারাশর

বাংলা বিজ্ঞান কথা
April 2024 | Vol. II | Issue 4

উপদেষ্টামণ্ডলী
স্বামী কমলাস্থানন্দ
প্রোঃ বিমল রায়
প্রোঃ অনুপম বসু
ডঃ সুমিত্রা চৌধুরী
প্রোঃ শুভব্রত রায়চৌধুরী

মুখ্য সম্পাদক
ডঃ নকুল পারাশর

সম্পাদকমণ্ডলী
ডঃ ভূপাতি চক্রবর্তী
প্রোঃ সিদ্ধার্থ জোয়ারদার
প্রোঃ শঙ্করাশিস মুখার্জি
অমিতেশ ব্যানার্জী

যোগাযোগের ঠিকানা
রামকৃষ্ণ মিশন
বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজ
রহড়া, কলকাতা 700118
শান্তি ফাউন্ডেশন
ইউ জি 17, জ্যোতি শিখর
ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, জনকপুরী
নয়া দিল্লী 110060
ফোন
+91 11 4036 5723
ইমেল
info@shantifoundation.global
ওয়েবসাইট
www.shantifoundation.global

'বাংলা বিজ্ঞান কথা'য় প্রকাশিত প্রবন্ধ, মতামত বা লেখকের ব্যবহৃত চিত্রের বিষয়ে প্রকাশকের কোনো দায়বদ্ধতা থাকবে না।

'বাংলা বিজ্ঞান কথা'য় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি কেবলমাত্র বিনামূল্যে বিতরিত কোনো মুদ্রণ মাধ্যমেই প্রকাশকের অগ্রিম অনুমতির ভিত্তিতে উপযুক্ত সূত্রমূলের উল্লেখসাপেক্ষে পুনর্মুদ্রণযোগ্য।

প্রকাশক
রামকৃষ্ণ মিশন
বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজ
রহড়া, কলকাতা 700118
এবং
শান্তি ফাউন্ডেশন
ইউ জি ১৭, জ্যোতি শিখর
ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, জনকপুরী
নয়া দিল্লী ১১০০৬০

Shanti Foundation

বিজ্ঞান সংবাদ

পৃথিবী ভেদী “ভুতুড়ে কণা”

আইসকিউব মানমন্দিরের কর্মরত বিজ্ঞানীরা পৃথিবীতে ভেদ করে চলাচল করে এমন সাতটি বিরলভাবে দেখা "ভুতুড়ে কণা" সনাক্ত করেছেন। অ্যান্টার্কটিকাতে বরফের গভীরে অবস্থিত এই মানমন্দিরটি প্রথম এই কণাগুলির বিষয়ে জানতে পারে প্রায় 10 বছর আগে। এই ভুতুড়ে কণাগুলি অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল টাউ নিউট্রিনো নামে পরিচিত এবং বলা যেতে পারে মহাকাশীয় ঘটনা ও মানুষের মধ্যে যোগসূত্র। নিউট্রিনোর ভর শূন্য এবং কোনো আধান নেই। এগুলি আলোর সমান গতিতে মহাকাশে ভ্রমণ করতে পারে। ফলে অন্য বস্তুর ওপর এদের বিশেষ কোনো প্রভাব নেই। প্রতি সেকেন্ডে প্রায় 100 ট্রিলিয়ন নিউট্রিনো কণা আমাদের দেহকে ভেদ করে চলাচল করে। কিন্তু তাদের অতি দ্রুত গতির জন্য আমাদের পক্ষে এগুলি লক্ষ্য করা প্রায় অসম্ভব, এইজন্যই তাদের ভুতুড়ে কণা নামকরণ হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, যদি প্রমান মানব শরীরের আকারের নিউট্রিনো ডিটেক্টর দিয়ে এই কণাগুলিকে শনাক্ত করার চেষ্টা করা হয়, তাহলেও এদের নাগাল পেতে প্রায় এক শতাব্দী সময় লাগবে। অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল নিউট্রিনো হল উচ্চ-শক্তিযুক্ত নিউট্রিনো যা মিল্কিওয়ের প্রান্তিক মহাজাগতিক উৎস থেকে উৎপন্ন হয়। 2013 সালে অবজারভেটরি প্রথম এই কণা সনাক্ত করে। বর্তমানে অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল টাউ নিউট্রিনোগুলির সনাক্তকরণের মাধ্যমে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মহাজাগতিকতার এক নতুন বার্তাবাহক খুঁজে পেয়েছেন। এই আবিষ্কার নিউট্রিনো গবেষণার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করবে বলে বিজ্ঞানীমহলের ধারণা।

ভারত মহাসাগরের অজানা প্রবাল সুপারহাইওয়ে

সম্প্রতি প্রকাশিত এক গবেষণায় দেখা গেছে যে সেশেলস সন্নিকটের প্রবাল প্রাচীরগুলি এক মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটারেরও বেশি জুড়ে ছড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। বিজ্ঞানীরা জেনেটিক বিশ্লেষণ এবং মহাসাগরীয় মডেলিং ব্যবহার করে দেখিয়েছেন যে সমুদ্রের স্রোত এই দূরবর্তী দ্বীপগুলির মধ্যে প্রবালের লার্ভা ছড়িয়ে দেয় যা এক ধরনের “প্রবাল সুপারহাইওয়ে” তৈরি করে। বিজ্ঞানীদের মতে এই আবিষ্কারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ প্রবাল প্রাচীর পুনরুদ্ধারের একটি মূল কারণ হল লার্ভার বিস্তার। যদিও জলবায়ু পরিবর্তন এবং অন্যান্য অনেক কারণে বিশ্বজুড়ে প্রবাল আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে, তবে প্রাচীরের স্বাস্থ্য এবং স্থিতিস্থাপকতা উন্নত করার জন্য স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। এই প্রচেষ্টাগুলি আরও কার্যকর হতে পারে যখন আমরা প্রবাল প্রাচীরগুলির মধ্যের সংযোগকে আরও ভালভাবে বুঝতে পারি। উদাহরণস্বরূপ, বলা যেতে পারে লার্ভার প্রধান উৎস হিসাবে প্রবাল প্রাচীরের চারপাশের সংরক্ষণ প্রচেষ্টাকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। গবেষকরা 19টি বিভিন্ন রিফ সাইট থেকে সংগৃহীত নমুনার উপর কাজ করেছেন। ব্যাপক জেনেটিক বিশ্লেষণ করার পরে তারা সমস্ত নমুনা সাইটের মধ্যে সাম্প্রতিক জিন প্রবাহ খুঁজে পেয়েছেন যা মাত্র কয়েক প্রজন্মের মধ্যে ঘটতে পারে। নতুন প্রবল প্রাচীর গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে এটি একটি ইতিবাচক ইঙ্গিত। এই গবেষণা গবেষকদের প্রবাল লার্ভার প্রাচীরগুলির মধ্যের গতিপথ এবং “প্রবাল সংযোগে” অবদান রাখার ক্ষেত্রে অন্যান্য জৈবিক প্রক্রিয়াগুলি বুঝতে সাহায্য করে। গবেষণাটি সেশেলস জুড়ে প্রাচীরগুলির মধ্যে প্রবাল লার্ভা ছড়িয়ে পড়ার ভবিষ্যত সম্ভাবনার কথা জানায়।

এইচআইভি নির্মূলে নতুন প্রযুক্তি

সাম্প্রতিককালে গবেষকদের একটি দল আধুনিক জিন-সম্পাদনা প্রযুক্তি CRISPR (ক্লাস্টারড রেগুলারলি ইন্টারস্পেসড শর্ট প্যালিনড্রোমিক রিপিটস) ব্যবহার করে এইচআইভি নিরাময়ের একটি সম্ভাবনাময় দিক তুলে ধরেছেন। এই পদ্ধতিতে CRISPR ব্যবহার করে আণবিক কাঁচির সাহায্যে সংক্রামিত কোষ থেকে এইচআইভির ডিএনএ কেটে ফেলার কথা বলা হয়েছে। যদিও বর্তমান চিকিৎসা পদ্ধতি এইচআইভি দমন করতে সক্ষম, কিন্তু এই পদ্ধতি এটি সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করতে পারে না। সংবাদ সংস্থার খবর অনুসারে প্রাথমিক পর্যায়ে থাকলেও এই নতুন গবেষণা ভাইরাসটিকে সম্পূর্ণ নির্মূল করার প্রতিশ্রুতি দেয়। আমস্টারডাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষক দল এক মেডিকেল কনফারেন্সে এ বিষয়ে তাদের গবেষণালব্ধ ফলাফল উপস্থাপনা করেছে। তাদের মতে এই গবেষণাটি এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে আছে এবং এই পদ্ধতি প্রয়োগের নিরাপত্তা এবং কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য আরও গবেষণা প্রয়োজন। স্টেম সেল এবং জিন থেরাপি প্রযুক্তির বিশেষজ্ঞরা এবিষয়ে একমত যে গবেষণাটির সম্পূর্ণ মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞদের মতে এই গবেষণার প্রধান আকর্ষণ হলো এইচআইভি রোগীর কোষে তার জিনোম সন্নিবেশিত করা এবং ধরে রাখার স্থায়ী প্রকৃতি অপসারণ করতে জিন-সম্পাদনা প্রযুক্তির ব্যবহার। তবে ফলাফলগুলি নিশ্চিত করে নির্দিষ্ট তথ্য মূল্যায়ন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এইচআইভি আক্রান্তদের উপর এর প্রয়োগের আগেএই পদ্ধতির আরও অনেক উন্নয়নের প্রয়োজন। এইচআইভি-1 আক্রান্ত শরীর থেকে এই ভাইরাস নির্মূল করার জন্য CRISPR-Cas9 প্রযুক্তি ব্যবহার করে এইডসের কার্যকরী নিরাময়ের ধারণাটি যথেষ্ট সম্ভাবনাপূর্ণ। ইতিমধ্যে অল্প সংখ্যক HIV-1-সংক্রমিত ব্যক্তির ক্লিনিকাল ট্রায়াল শুরু হয়েছে।

হৃদরোগ সনাক্তকরণে রক্তপরীক্ষা

একটি রক্ত পরীক্ষা বলে দিতে পারে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে হৃদরোগে থেকে মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে কিনা। সম্প্রতি ইউরোপিয়ান জার্নাল অফ হার্ট ফেইলিউর-এ প্রকাশিত ব্রিটিশ হার্ট ফাউন্ডেশন (বিএইচএফ)-এর আর্থিক সহায়তায় করা এই গবেষণাটি এমনই আশার কথা জানাচ্ছে। এই গবেষণার অন্যতম শরিক হলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রদীপ ঝুন্ড। গবেষকরা বলেছেন যে রক্তে হরমোন বি-টাইপ ন্যাট্রিউরেটিক পেপটাইড (বিএনপি) এবং নিউরোপেপটাইড ওয়াই (এনপিওয়াই) নামক একটি প্রোটিনের পরিমান হৃদযন্ত্রের ব্যর্থতার বা ঝুঁকির আগাম খবর দিতে পারে। গবেষকদের মতে চিকিৎসা ব্যবস্থায়য় প্রভূত অগ্রগতি সত্ত্বেও হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীদের মৃত্যুর উচ্চ ঝুঁকি রয়েছে। এই গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে রক্তে এনপিওয়াই-এর পরিমাপ হৃদরোগীদের মারা যাওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে পূর্বাভাস দিতে সক্ষম। গবেষকদের ধারণা, এই শনাক্তকরণের মাধ্যমে হৃদরোগীদের আরো ভালো মানের চিকিৎসা সম্ভব। হার্ট ফেইলিওর তখনই ঘটে যখন হৃদপিণ্ড শরীরের চারপাশে প্রয়োজনীয় রক্ত সরবরাহ করতে পারে না। এটি রোগীর ক্ষেত্রে এমন একটি অবস্থা যার ফলে রোগীকে ঘন ঘন হাসপাতালে যেতে হয়, জীবনকাল ক্রমশ কমে যায় এবং বর্তমানে এর কোনো প্রতিকার নেই। চরম চাপের প্রতিক্রিয়ায় হৃদয়ের স্নায়ু দ্বারা অধিক এনপিওয়াই নিঃসৃত হয়। এটি হৃৎপিণ্ডের সম্ভাব্য বিপজ্জনক অবস্থার শনাক্তকারী হিসাবে কাজ করতে পারে। বিভিন্ন পর্যায়ের 800 জনেরও বেশি হৃদরোগী এই গবেষণায় অংশগ্রহণ করেন এবং তাদের বি-টাইপ ন্যাট্রিউরেটিক পেপটাইড (BNP) হরমোনের মাত্রা পরিমাপ করা হয়েছিল। গবেষকদের মতে এই গবেষণার ফলাফল হৃদচিকিৎসার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত করেছে। স্ট্রেস হরমোনের উপর বিগত 10 বছরেরও বেশি গবেষণার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে এই পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। গবেষকদের আশা, এই গবেষণা ভবিষ্যতে ক্রমবর্ধমান হৃদরোগীদের জন্য যথেষ্ট উপকারী বলে প্রমাণিত হবে।

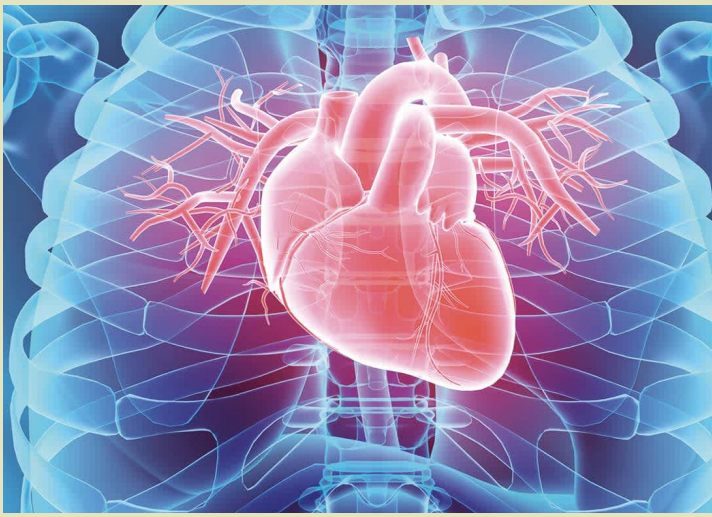

ক্ষণিকের ঝলক

রাজকুমার রায়চৌধুরী

2023-এর পদার্থবিদ্যায় নোবেলজয়ী গবেষণার বিষয়ে মনগ্রাহী প্রবন্ধ।

2023 সালে পদার্থ বিদ্যায় তিন বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার পান। এঁরা হলেন যথাক্রমে পিয়ের অগস্তিনি (Pierre Agostini), অ্যান লুলিয়ের (Anne L' Luillier) এবং ফেরেন্স ক্রাউস (Ferenc Krausz)। প্রথম দুজন ফরাসী এবং শেষ জন অস্ট্রো-হাঙারিয়ান। অবশ্য অগস্তিনি কাজ করেছেন আমেরিকার ওহাইও স্টেট ইউনিভার্সিটিতে এবং লুলিয়ের গবেষণা করেছিলেন সুইডেনের লান্ড (Lund) ইউনিভার্সিটিতে এবং ক্রাউসের গবেষণাগার জার্মানীর ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনস্টিটিউট অফ কোয়ান্টাম অপটিক্স। এঁরা যে বিষয়ে কাজ করেছিলেন তা হ'ল অ্যাটোসেকেন্ড ফিজিক্স (Attosecond physics)।

অ্যাটোসেকেন্ড এত ক্ষুদ্র সময় যে আমরা কিছুতেই সেটা কল্পনা করতে পারবো না। এক সেকেন্ডকে যদি একশো কোটি ভাগে ভাগ করি এবং প্রতিটি ভাগকে আবার একশো কোটি ভাগ করি তবে তা হবে অ্যাটোসেকেন্ড। এত ক্ষুদ্র সময় দরকার হয়েছিল পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনের গতিবিধি লক্ষ করার জন্য। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ঘরের দ্রুত ঘূর্ণায়মান সিলিং ফ্যানের ব্লেডগুলি সাধারণ অবস্থায় আমাদের দৃষ্টতে ধরা পরে না। এমনকি, ফ্যানটি চালু অবস্থায় ব্লেডের উপরের ছাদের অংশও আমরা দেখতে পাই, দ্রুত ঘূর্ণায়মান ব্লেডগুলো আমাদের দৃষ্টিতে কোনো অবরোধ তৈরী করে না। কিন্তু হাই শাটার স্পীডের কোন ক্যামেরা দিয়ে ঘুরন্ত পাখার ছবি তুললে পাখাটি স্থির দেখাবে। এখন ICCD ক্যামেরা উদ্ভাবন হয়েছে যার শাটার স্পীড প্রায় ন্যানো সেকেন্ডের মতন। কিন্তু এত উন্নত প্রযুক্তির ক্যামেরা ব্যবহার করেও পরমাণুর ভিতর ইলেকট্রনের চলাফেরা পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া এরকম কোন ক্যামেরা দিয়েই ইলেকট্রনকে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয়, কারণ ইলেকট্রনের মত অতিক্ষুদ্র বস্তুর ক্ষেত্রে যে তত্ত্ব প্রয়োগ করা হয় তা হ'ল কোয়ান্টাম মেকানিক্স।

কোয়ান্টাম তত্ত্বের আবিষ্কারক ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক (1858–

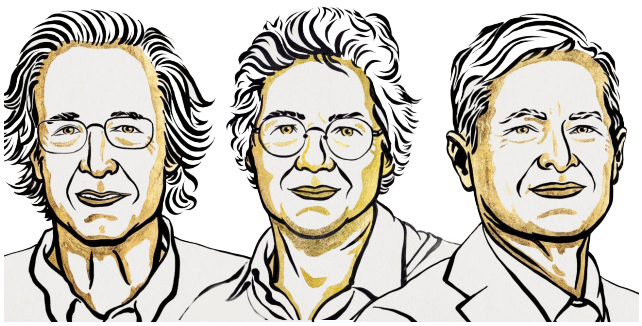

পিয়ের অগস্তিনি অ্যান লুলিয়ের ফেরেন্স ক্রাউস

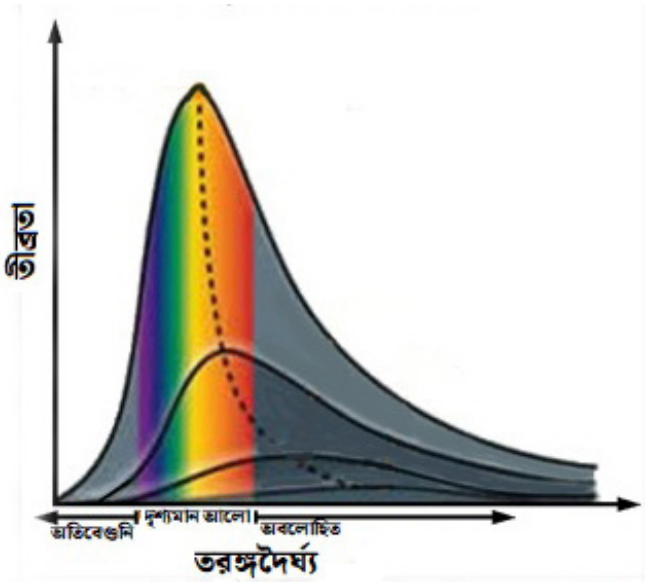

কৃষ্ণ বস্তু বিকিরণের রেখাচিত্র

1947)। পরবর্তী সময়ে এই তত্ত্বের ভিত্তিতে উদ্ভূত হয় কোয়ান্টাম মেকানিক্স। প্ল্যাঙ্ক কৃষ্ণ বস্তু রেডিয়েশনের উপর কাজ করছিলেন। আদর্শ কৃষ্ণ বস্তু তৈরী করা সম্ভব নয়, তবে যদি একটি গোলকের ভিতরে ভুষো বা অন্য কিছু দিয়ে ভিতরটা সম্পূর্ণ কালো রং করা হয় এবং গোলকটিতে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র করা হয় তাহলে ছিদ্র দিয়ে যে আলো প্রবেশ করবে তা এই গোলকটি সব শোষণ করে নেবে। এরপর ওই কৃষ্ণ বস্তু থেকে যে বিকীরণ নির্গত হবে তা পরীক্ষাগারে মাপা যায়। এর পর আমরা তাপমাত্রার সঙ্গে বিকীরণের তরঙ্গদৈর্ঘের যে সম্পর্ক তার রেখাচিত্র (graph) আঁকতে পারি। প্ল্যাঙ্ক দেখলেন প্রচলিত কোন তত্ত্বই এই রেখাচিত্রকে ব্যাখ্যা করতে পারছেনা। অনেক তাত্ত্বিক গবেষণা করে প্ল্যাঙ্ক দেখলেন আলোকে যদি কণার সমষ্টি হিসেবে ধরা যায় তবে এই রেখাচিত্রটি সম্পূর্ণ ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। তিনি যে ফরমূলা আবিষ্কার করেছিলেন তাকে প্ল্যাঙ্ক ডিস্ট্রিবিউশন বলা হয়। পরে সত্যেন্দ্রনাথ বোস (1894–1974) আইনস্টাইনের থিয়োরী অনুযায়ী আলোকে ফোটন কণার সমষ্টি হিসেবে ধরে প্ল্যাঙ্কের ফরমূলা আহরণ করেন। প্রায় তিনশো বছরের বেশী আগে নিউটন (1643–1727) আলোর করপাসকুলার (Corpuscular) ধর্মের কথা উল্লেখ করেছিলেন৷ তখন তাঁর এই তত্ব তৎকালীন বিজ্ঞানীরা গ্রহণ করেন নি। এরও বহু বছর আগে জৈন দার্শনিকরা আলোর এই করপাসকুলার ধর্মের কথা লিখেগেছেন। তবে বলে নেওয়া উচিত এই ধারণার সঙ্গে কোয়ান্টাম থিয়োরী অফ লাইটের কোন যোগাযোগ নেই। নিউটনের আমলেও প্রযুক্তি এমন উন্নত ছিলনা যাতে ল্যাবরেটরিতে আলোর এই ধর্ম প্রমাণ করা যেতে পারে।

টমাস ইয়ং (1773–1829) পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে আলোর তরঙ্গ ধর্ম সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এখানে অবশ্যই উল্লেখ যোগ্য যে ক্রিস্টিয়ান হাইগেনস (Christiaan Hygens- ১৬২৯—১৬৯৫) যিনি একাধারে গণিতবিদ , পদার্থবিদ, জ্যোতির্বিদ ও উদ্ভাবক ছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে আলো হল দৈর্ঘ্য তরঙ্গ (longitudinal wave)। প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তাদের মধ্যে ছিলেন

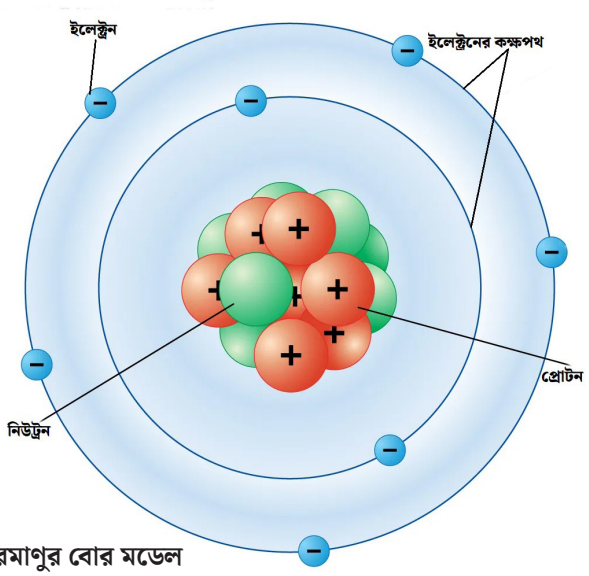

পরমাণুর বোর মডেল

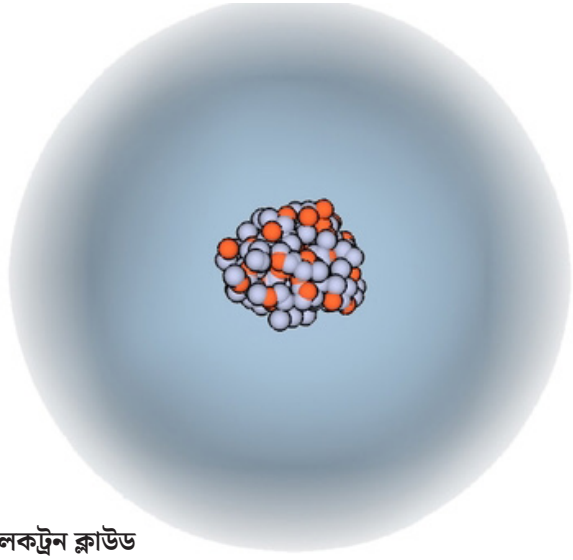

ইলেকট্রন ক্লাউড

আইনস্টাইন (1879–1955) ও নীলস বোর (1885–1962)। বস্তুত আইনস্টাইন নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন মূলত ফোটো ইলেকট্রিক এফেক্টের উপর তাঁর কাজের উপর যা কোয়ান্টাম তত্ত্বকে মান্যতা দেয়। রাদারফোর্ড (1871—1937) সোনার পাতের সঙ্গে আলফা ও বিটা কণার সংঘর্ষ ঘটিয়ে পরমাণুর গঠন (structure) জানার প্রয়াস করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর গবেষণাপত্র “The scattering of alpha and beta particles and the structure of the atom” উল্লেখযোগ্য। তিনি ও তাঁর ছাত্ররা পরীক্ষা করে দেখেছিলেন সোনার পাতের সঙ্গে আলফা কণার সংঘাতে বেশীর ভাগ সময়ে আলফা কণার গতিপথের কোন পরিবর্তন হয়না। খুব কম ক্ষেত্রে (আনুমানিক প্রায় কুড়ি হাজারে একবার) আলফা কণার গতি পথের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়। রাদারফোর্ড অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা ও অংকের সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে একটি পরমাণুর বেশীর ভাগটাই ফাঁপা। প্রায় সমস্ত ভর রয়েছে তার কেন্দ্রে।

নীলস বোর বিখ্যাত তাঁর বোর মডেলের জন্য (Bohr model)। এই মডেলে হাইড্রোজেন পরমাণুকে সৌর জগতের মত ধরে নেওয়া হয়। পরমাণুর কেন্দ্রে একটি ভারী কণা আছে, যার নাম প্রোটন। আর একটি ইলেকট্রন এই প্রোটনকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকারে ঘুরে চলেছে। অবশ্যই এই ঘূর্ণন কোয়ান্টাম সূত্র মেনে চলে। সৌরজগতে যে বল কাজ করে তা হল মহাকর্ষ। আর হাইড্রোজেন পরমাণুর ক্ষেত্রে এটি হল কুলম্ব ফোর্স (Coulomb force)। মহাকর্ষ বল পারমাণবিক কণাগুলির মধ্যেও উপস্থিত থাকে, যদিও এর পরিমান কুলম্ব বলের তুলনায় নগন্য।

হাইড্রোজেন পরমাণুর স্প্রেকটাম যা ল্যাবরেটারিতে পরীক্ষা করে পাওয়া যায় তার সঙ্গে বোর মডেলের গাণিতিক ফরমুলা মিলে যায়। অবশ্য আরো সূক্ষ পরীক্ষায় যে তথ্য পাওয়া যায় তা

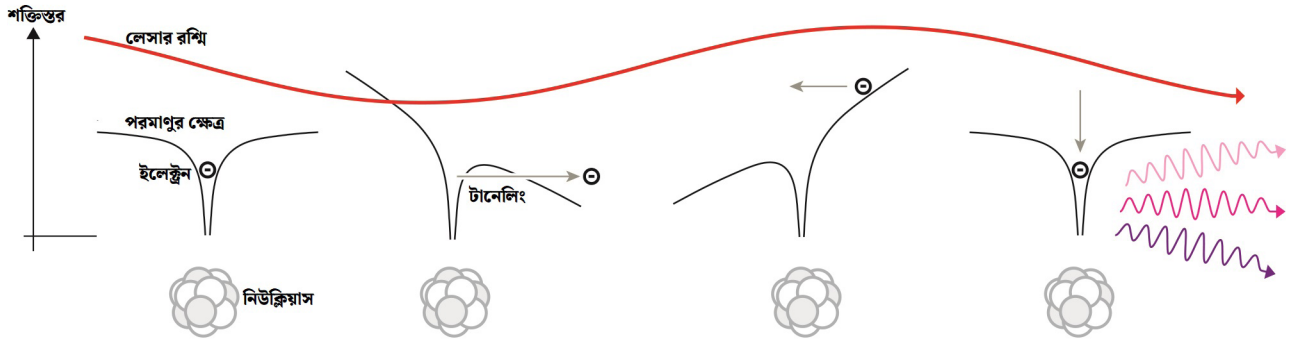

১ পরমাণুর নিউক্লিয়াসের পশে আবদ্ধ ইলেক্ট্রন সাধারণভাবে পরমাণু থেকে বেরিয়ে যেতে পারে না। এর মধ্যে এমন পরিমান শক্তি থাকে না যেতে এটি পরমাণুর বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারে।

২ পরমাণুর ক্ষেত্র লেসার রশ্মির প্রভাবে পরিবর্তিত হয়। সেই সময় খুবই পাতলা প্রাচীর দ্বারা আবদ্ধ ইলেক্ট্রন কোয়ান্টাম বলবিদ্যার নিয়ম মেনে ওই ক্ষেত্রে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে।

৩ মুক্ত ইলেক্ট্রন লেসার রশ্মির প্রভাবে কিছু পরিমান শক্তি সঞ্চয় করে। যখন পরমাণুর ক্ষেত্র ঘুরে গিয়ে নিজের অবস্থান পরিবর্তন করে তখন মুক্ত ইলেক্ট্রনটি তার প্রথম অবস্থানে ফিরে যায়।

৪ পরমাণুর নিউক্লিয়াসের পশে ফিরে আসার জন্য ইলেক্ট্রনটিকে তার অর্জিত অতিরিক্ত শক্তি বর্জন করতে হয়। এই শক্তি অতিবেগুনি তরঙ্গাকারে নির্গত হয়। এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য লেসার ক্ষেত্রে ওপর নির্ভরশীল এবং ইলেক্ট্রনটি কতটা পথ ভ্রমণ করেছে তার ওপর নির্ভর করে এর ভিন্ন ভিন্ন মান পাওয়া যায়।

গ্যাস পরমাণুর ওপর লেসার রশ্মির প্রতিক্রিয়া

একমাত্র ডিরাকের (1902–1984) ফরমূলায় ব্যাখ্যা করা যায়। আমরা এখানে তার বিশদ বিবরণে যাবনা। তবে বলা যায় 1930 দশকে কোয়ান্টায়াম তত্ত্বের প্রায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এই গবেষণায় যুক্ত ছিলেন। যেমন ডিরাক, শ্রয়ডিঙ্গার (1887–1961), হাইসেনবার্গ (1901–1976), ফার্মি (1901–1954), পাউলি (1900–1958), এবং আরো বিশিষ্ট বিজ্ঞানী যাঁরা প্রায় সবাই পদার্থবিদ্যায় নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। এর মধ্যে বলা যায় সবচেয়ে বৈপ্লবিক তত্ত্বের আবিষ্কারক হলেন হাইসেনবার্গ। এটি 'অনিশ্চয়তা তত্ত্ব' (Uncertainty principle) নামে প্রসিদ্ধ। এই তত্ত্বের মতে কোন কণারই একই সঙ্গে ভরবেগ (momentum) ও তার অবস্থান পর্যবেক্ষণ করা যাবেনা। এটা যন্ত্রের সীমিত ক্ষমতার জন্য নয়, এটা প্রকৃতির নিয়ম।

অর্থাৎ বোরের মডেলে যে চিত্র ছিল তা ছিল অতি সরলীকৃত রূপ। এখন যদি আদৌও পরমাণুর ভিতর ইলেকট্রনের গতিবিধির চিত্র কল্পনা করা যায় তবে তা হবে ইলেকট্রন ক্লাউড। অর্থাৎ আমরা শুধু জানব কোন স্থানে ইলেকট্রনের উপস্থিতির সম্ভাবনা কতটা। কোয়ান্টায়ামের জগৎ হল সম্ভাবনার জগৎ। তাহলে 2023 সালে যাঁরা নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন, তাঁরা তো ইলেকট্রনের গতিবিধি ধরতে পেরেছিলেন বলে জানা গেছে। তবে কি তাঁদের আবিষ্কার কি হাইসেনবার্গের তত্ত্বকে ভুল প্রমানিত করে? আর তাঁরা পরমাণুর ভিতরে ইলেকট্রনের

লেসার আলোকে গ্যাসের পরমাণুর মধ্যে চালনা করলে অতিবেগুনি ওভারটোন সৃষ্টি হয়। উপযুক্ত পরিস্থিতিতে এর অনেকগুলি পর্যায় থাকে। এর চক্রগুলি পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে অ্যাটোসেকেন্ড পালস সৃষ্টি করে।

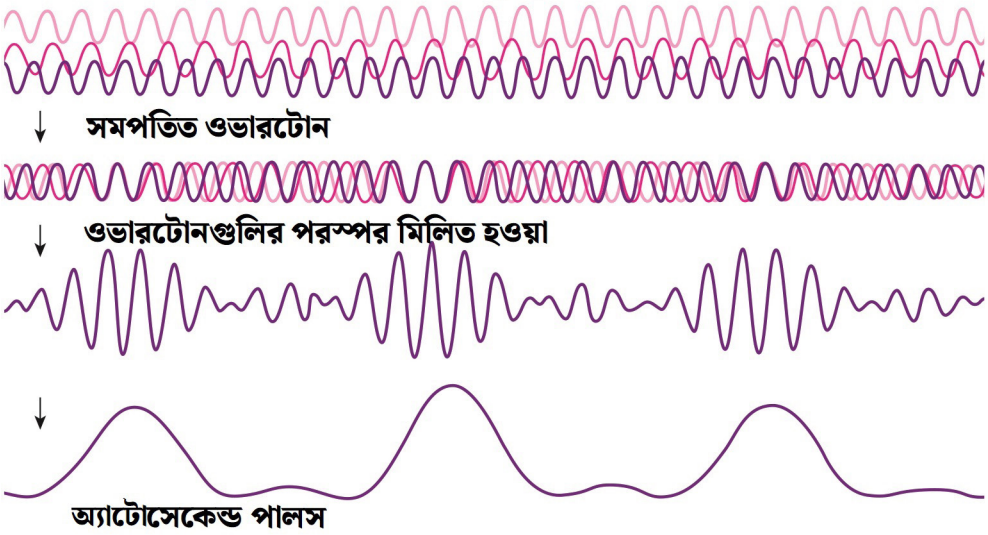

অটোসেকেন্ড পালস যেভাবে সৃষ্টি হয়

অটোসেকেন্ড পালস ব্যবহার করে ইলেক্ট্রন পর্যবেক্ষণ

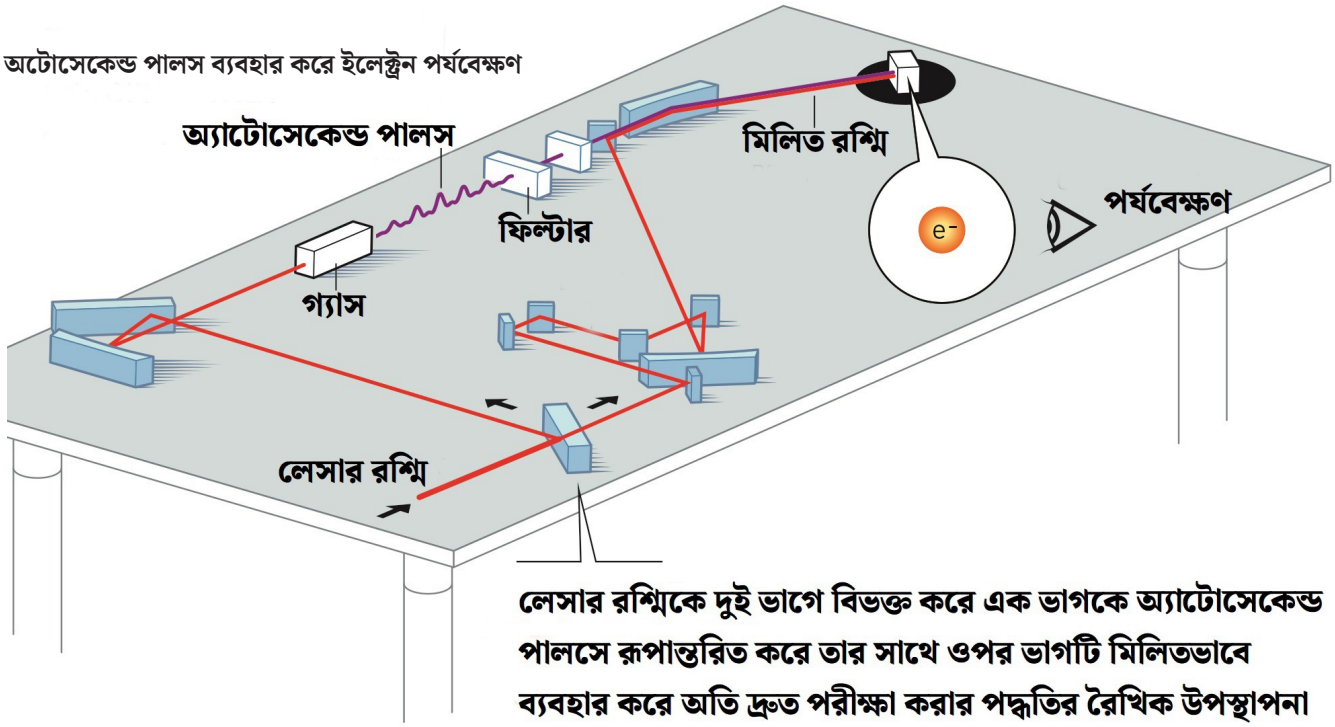

লেসার রশ্মিকে দুই ভাগে বিভক্ত করে এক ভাগকে অ্যাটোসেকেন্ড পালসে রূপান্তরিত করে তার সাথে ওপর ভাগটি মিলিতভাবে ব্যবহার করে অতি দ্রুত পরীক্ষা করার পদ্ধতির রৈখিক উপস্থাপনা

অবস্থিতি ধরলেন কি করে? এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে, কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী আলো ফোটন কণার সমষ্টি হলেও আলোর তরঙ্গ ধর্মও পরীক্ষিত। বস্তুত লুই ডি ব্রগলির (1892–1987) তত্ত্ব অনুযায়ী শুধু আলো নয়, সমস্ত কণারই এই দ্বৈত বা ডুয়াল চরিত্র আছে। ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন প্রভৃতি সব কণার মধ্যেই এই দ্বৈত চরিত্র দেখা যায়। খুব বড় বস্তুর ক্ষেত্রে এই তরঙ্গের দৈর্ঘ খুব বেশী বলে তা ল্যাবরেটরিতে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয়।

এখন আমরা আলোচনা করব 2023 সালে যাঁরা পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়ে ছিলেন তাঁদের গবেষণার মূল বিষয় নিয়ে। এঁরা পরমাণুর ভিতর ইলেকট্রনের গতিবিধি লক্ষ করার জন্য অতি অল্প সময় স্থায়ী আলোর ঝলক বা pulse তৈরী করেছিলেন যার সময়ের মাপ করা হয় অ্যাটোসেকেন্ডের এককে। এটি সম্ভব হয়েছিল বিভিন্ন তরঙ্গের আলোর (লেজার রশ্মি) মিশ্রণে এক জটিল এবং অত্যন্ত উন্নত মানের প্রযুক্তি ব্যবহার করে। এই লেজার রশ্মি দিয়ে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের (যেমন নিয়ন, আর্গন, ক্রিপটন ইত্যাদি) পরমাণুর সাথে আলোর সংঘাত ঘটিয়ে কিভাবে আমরা ইলেকট্রনের গতিবিধি আমরা জানতে পারব? না, সরাসরি আমরা ইলেকট্রনকে দেখতে পারব না। তবে ওই সব গ্যাসের অভ্যন্তরে যে ইলেকট্রন আছে তাদের সঙ্গে লেজার রশ্মির সংঘাতে কিছু ইলেকট্রন বেরিয়ে আসতে পারে। আবার কিছু ইলেকট্রন আলোর থেকে শক্তি অর্জন করবে এবং অচিরে তার থেকে আলোর বিকিরণ হবে। তবে স্বাভাবিক কারণেই শোষিত আলোর কম্পাঙ্ক থেকে এই বিকিরণের কম্পাঙ্ক কম হবে। এই বিকিরণকে ধরতে গেলে অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী আলোর পালস্ দরকার। এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সময়ের একক হল অ্যাটোসেকেন্ড। এই এককের মাপে একশো তিরিশ একক স্থায়ী পালস তৈরী করতো সক্ষম হয়েছিলেন অগস্তিনি।

কিন্তু ইলেকট্রন ও তার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে পারলে কি তা হাইসেনবার্গের অনিশ্চয়তা তত্ত্বকে ভুল প্রমাণিত করবে? এখনি তা বলা যাচ্ছেনা। কারণ স্বয়ং লুলিয়ের বলেছেন যে ইলেকট্রনকে তাঁরা ধরতে পেরেছেন ঠিকই, কিন্তু তার ছবি যথেষ্ট স্পষ্ট নয়। ছবিটি বেশ ঝাপসা (blurry)।

একটা প্রশ্ন সাধারণ মানুষ করতেই পারেন। এই আবিষ্কার পদার্থবিজ্ঞানের বিশেষ আবিষ্কার সন্দেহ নেই, কিন্তু সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে কি কাজে লাগবে। প্রথমেই বলে রাখি বিজ্ঞানের কোন আবিষ্কারের পর বেশ কিছুদিন লাগে আমাদের জীবনে তার ব্যবহারিক প্রয়োগে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় রন্টজেন (1845–1923) যখন এক্সরে আবিষ্কার করেছিলেন তখন কি ভেবেছিলেন চিকিৎসা বিজ্ঞানে এর এত ব্যাপক প্রয়োগ হবে যে প্রত্যন্ত গ্রামের লোকেরাও এক্সরে শব্দটার সঙ্গে পরিচিত হবে। আবার এখন আমরা দৈনন্দিন জীবনে যে সমস্ত গ্যাজেট ব্যবহার করি তার অধিকাংশ যেমন সেলফোন, কমপিউটার, টিভি ইত্যাদি তৈরী করা সম্ভব হয়েছে কোয়ান্টাম মেকানিক্স ও আলো যে বিদ্যুতচৌম্বকীয় তরঙ্গ এই তথ্যের আবিষ্কারের ওপর ভিত্তি করে। 2023 সালে যাঁরা পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, তাঁদের এবং আরো অনেক বৈজ্ঞানিকদের মতে ক্যানসার ইত্যাদি জটিল রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এই আবিষ্কার কাজে লাগবে। এর প্রয়োগ হয়ত হবে সুদুর প্রসারী।

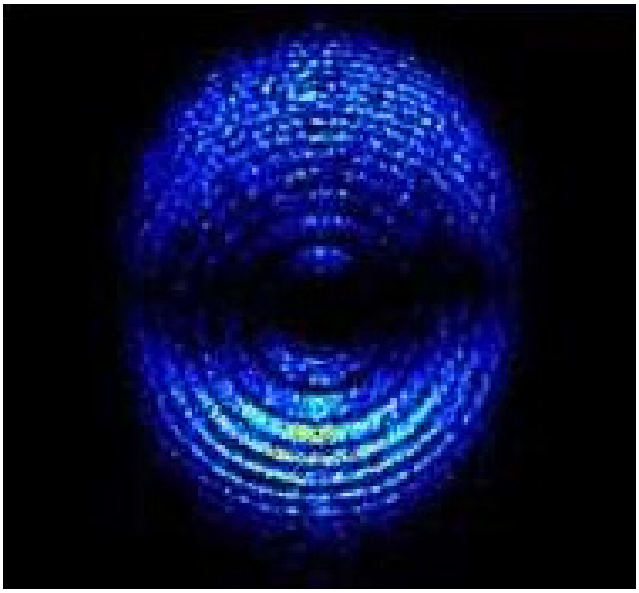

লুলিয়ের কর্তৃক গৃহীত ইলেক্ট্রনের ফটো

বৈজ্ঞানিকদের মতে ক্যানসার ইত্যাদি জটিল রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এই আবিষ্কার কাজে লাগবে। এর প্রয়োগ হয়ত হবে সুদুর প্রসারী।

এখানে আর একটা কথা বলা দরকার। বিজ্ঞানে কোন তত্ত্বই ধ্রুব সত্য নয়। যতক্ষণ সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা কোন বিশেষ থিয়োরীর সমস্ত গণনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে ততক্ষণই সেই তত্ত্বতে আমরা বিশ্বাস করি। অবশ্য একটি মাত্র পরীক্ষা বা নিরীক্ষা কোন তত্ত্বকে ভুল প্রমাণিত করতে পারে। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব আড়াইশো বছরেরও বেশী সময় ধরে প্রায় ঈশ্বর প্রদত্ত তত্ত্ব বলে গণ্য হত। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কোয়ান্টাম তত্ত্ব ও আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ প্রমাণ করল নিউটনের তত্ত্ব সব জায়গায় খাটেনা। অতি ক্ষুদ্র বস্তুর ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম তত্ত্ব ও মহাবিশ্ব গবেষণায় আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ এখনো পর্যন্ত ভুল প্রমাণিত হয়নি। অতি দ্রুতগতিতে চলা বস্তুর ক্ষেত্রেও নিউটনের তত্ত্ব খাটবেনা। তবে এখনো পর্যন্ত সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ ও কোয়ান্টাম তত্ত্বকে একসূত্রে বাঁধা যায়নি। তবে বিজ্ঞানে কোন জিনিসই থেমে থাকেনা। ভবিষ্যতে অ্যাটোসেকেন্ডের থেকেও কম সময়ের পালস তৈরী করা সম্ভব হলে সৃষ্টি রহস্যের উন্মোচনের দিকে আরো একধাপ এগোনো যাবে।

*লেখক **ডঃ রাজকুমার রায়চৌধুরী** কলকাতার ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইন্সটিটিউটের পদার্থবিদ্যা ও ফলিত গণিত বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান এবং বহু লোকবিজ্ঞান প্রবন্ধের রচয়িতা। ইমেল: rroychoudhury123@gmail.com*

ঁপন্ত্রী চচর্শী সে

অমিতেশ ব্যানার্জী

1482 সাল। ইতালির মিলান শহরের ভবিষ্যৎ ডিউক লুডোভিকো স্ফরজা নিজের সেনাদলের সামরিক কাজের সুবিধার জন্য কিছু প্রকৌশলী নিয়োগ করবেন বলে জানা গেল। ঠিক সেই সময়েই তিনি এমন একটি দরখাস্ত পেলেন যা অদ্ভুত ও বিস্ময়কর বললেও কম বলা হয়। দরখাস্তকারী 30 বছরের যুবক এক ইতালীয় শিল্পী। দরখাস্তের সরল সংক্ষেপ বাংলা অনুবাদ করলে সেটা অনেকটা এরকম হবে—

বর্তমানে যারা সামরিক যন্ত্রের কারিগর বলে গণ্য, তাদের সকলের কৃতিত্বকে পর্যাপ্তভাবে পর্যালোচনা করে এবং তাদের প্রত্যেকের প্রতি যোগ্য সম্মান জানিয়ে আমি আমার নিজস্ব উদ্ভাবনী চিন্তাধারা ও কাজের পরিচয় রাখতে চাই। আমার উদ্ভাবিত যন্ত্রগুলির আংশিক বা সম্পূর্ণ কার্যকারিতা নিচের তালিকায় ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব।

- ◆ *আমি এমন হালকা, মজবুত এবং সহজে বহনযোগ্য সেতু নির্মাণ করতে পারি যার সাহায্যে পলায়নপর শত্রুসৈন্যের পশ্চাৎধাবন সহজ হবে। এই সেতুগুলি যথেষ্ট টেকসই ও অগ্নিনিরোধক হবে যাতে শত্রুরা সহজে এগুলি ধ্বংস না করতে পারে।*
- ◆ *অবরুদ্ধ ভূখণ্ডে পরিখা থেকে জল অপসারণ করা এবং অবরোধ থেকে মুক্তির জন্য বহু সংখ্যক সেতু ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য যন্ত্রপাতি তৈরি করার কৌশল আমার করায়ত্ত।*
- ◆ *যদি অবরোধের সময় অবস্থানগত সুবিধার কারণে শত্রুসৈন্যের থেকে বোমাবর্ষণ করার সম্ভাবনা থাকে, যে কোনো অবস্থানেই পাথরের আঘাত প্রতিহত করার পদ্ধতি আমার জানা আছে।*
- ◆ *আমি এমন কামান তৈরী করতে পারি, যা ব্যবহারে সুবিধাজনক, সহজে বহনযোগ্য এবং যা প্রায় শিলাবৃষ্টি-ঝড়ের মতো ছোট পাথর ছুঁড়তে সক্ষম, উপরন্তু কামান থেকে নির্গত ধোঁয়া শত্রুদের মধ্যে বিভ্রান্তি ও ভীতি জাগিয়ে তুলবে।*
- ◆ *আত্মরক্ষার তাগিদে সেনা দলের নির্ধারিত স্থানে পৌঁছানোর জন্য খনি বা গোপন ঘূর্ণায়মান পথ, এমনকি পরিখা বা যে কোনও নদীর তলদেশ দিয়েও সম্পূর্ণ নিঃশব্দে খনন করে পথ তৈরী করার প্রযুক্তি আমার জানা।*

- ◆ *আমি এমন আচ্ছাদিত যানবাহন তৈরি করতে পারি যা নিরাপদে শত্রু সেনাবাহিনী ভেদ করে যেতে সক্ষম হবে, শত্রু সেনাবাহিনী যত বড় বা যত সশস্ত্রই হোক না কেন। এর পিছনে অনুসরণকারী পদাতিক বাহিনী নিরাপদে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে।*
- ◆ *এছাড়াও, প্রয়োজন দেখা দিলে, আমি কামান, মর্টার এবং খুব সুন্দর এবং কার্যকরী নকশার হালকা অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করব যা একেবারেই সাধারণের ধারণার বাইরে।*
- ◆ *যেখানে কামানের ব্যবহার অসুবিধাজনক, সেখানে আমি এমন ক্যাটাপল্ট, ম্যাঙ্গোনেল, ট্রেবুকেট এবং বিস্ময়কর দক্ষতার অন্যান্য যন্ত্রপাতি তৈরী করতে পারবো যা এখনো মানুষের কাছে পরিচিত নয়। সংক্ষেপে, পরিস্থিতির বিভিন্নতা বিচার করে আমি আক্রমণ এবং প্রতিরক্ষা উভয় কাজের জন্য বহুবিধ অস্ত্র তৈরি করতে সক্ষম।*
- ◆ *সামুদ্রিক বা জলযুদ্ধের জন্য আমার আবিষ্কার করা এমন অনেক যন্ত্র রয়েছে যা আক্রমণ বা প্রতিরক্ষার জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত এবং যা নিপুণতার সঙ্গে শত্রুর সমস্ত ভারী কামান এবং অন্যান্য অস্ত্রের আঘাত প্রতিহত করবে।*
- ◆ *শান্তির সময়ে আমি সরকারী এবং বেসরকারী ভবন নির্মাণে এবং এক স্থান থেকে অন্য জায়গায় জল সঞ্চালনের ক্ষেত্রে বা অন্যান্য স্থাপত্যের ক্ষেত্রেও সন্তোষজনক কাজ করতে পারি।*
- ◆ *এছাড়াও আমি মার্বেল, ব্রোঞ্জ এবং মাটির ভাস্কর্য তৈরী করতে পারি। একইভাবে চিত্রকলাতেও আমার যথেষ্ট দক্ষতা আছে।*

যদি উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলির মধ্যে কোনটি কারো কাছে অসম্ভব বা অবাস্তব বলে মনে হয়, আমি যে কোন জায়গায় সেগুলি প্রদর্শন ও প্রমান করার জন্য প্রস্তুত।

এই যুবকের এই একটিমাত্র দরখাস্তই তার বহুব্যাপ্ত প্রযুক্তিজ্ঞানের পরিচয় তুলে ধরে। আশাকরি সবাই বুঝে গেছেন, এই যুবকই হলেন ইউরোপের নবজাগরণের যুগের অন্যতম বহুমুখী প্রতিভা লিওনার্দো দা ভিঞ্চি যিনি ছিলেন একাধারে একজন চিত্রশিল্পী, ড্রাফটসম্যান, প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী, তাত্ত্বিক, ভাস্কর এবং স্থপতি। যদিও প্রাথমিকভাবে তিনি একজন চিত্রশিল্পী হিসাবে খ্যাত, তার কাজের পরিধি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, রসায়ন, ভূতত্ত্ব, জ্যামিতি, হাইড্রোডাইনামিক্স, গণিত, যান্ত্রিক প্রকৌশল, আলোকবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, বিস্ফোরণবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, শারীরবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, মানচিত্র এবং জীবাশ্মবিদ্যা সহ বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপ্ত ছিল। চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর লিওনার্দো চিরস্মরণীয় তার কালজয়ী কাজের জন্য। আজ আমাদের আলোচনার বিষয় বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ লিওনার্দো।

লিওনার্দোর সম্পূর্ণ নাম লিওনার্দো ডি সের পিয়েরো দা ভিঞ্চি যার অর্থ “ভিঞ্চি শহরের সের পিয়েরোর পুত্র লিওনার্দো”। জন্ম 15 এপ্রিল 1452 সালে ভিঞ্চির পাহাড়ি শহর টাস্কানে, যদিও তার এই জন্মদিন বা স্থান নিয়ে দ্বিমত আছে। তার বাল্যকাল সম্পর্কেও বিশেষ কিছু জানা যায় না। যদিও

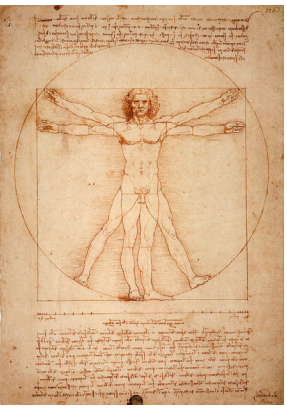
ভিট্রুভিয়ান ম্যান

জীবদ্দশায় তিনি প্রকৌশল এবং যন্ত্র আবিষ্কারের কাজে নিযুক্ত ছিলেন, তার বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নের সম্পূর্ণ পরিধি স্বীকৃতি পেয়েছে গত 150 বছরে। একজন বিজ্ঞানী হিসাবে লিওনার্দোর ল্যাটিন এবং গণিতে কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না। ফলে তার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি তৎকালীন এবং পরবর্তী বৈজ্ঞানিকদের কাছে উপেক্ষিত হয়। একজন প্রকৌশলী হিসেবে লিওনার্দো তার নিজের সময়ের চেয়ে অনেক এগিয়ে ছিলেন। ধারণাগতভাবে প্যারাসুট, হেলিকপ্টার, সাঁজোয়া যুদ্ধযান, ঘনীভূত সৌর শক্তির ব্যবহার, প্লেট টেকটোনিক্সের প্রাথমিক তত্ত্ব এবং দুই-প্রাচীর বিশিষ্ট খোলযুক্ত জাহাজ তিনিই আবিষ্কার করেছিলেন। শারীরবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, আলোকবিদ্যা এবং হাইড্রোডাইনামিকসের ক্ষেত্রেও তার গভীর জ্ঞান ছিল। শেষ জীবনে তার শরীরের কিছু অংশ পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়ে পরে বলে মনে করা হয়। হয়তো মোনালিসা চিত্রটি অসম্পূর্ণ থাকার প্রধান কারণ এই শারীরিক প্রতিবন্ধকতা। সম্ভবত 1519 সালের 2রা মে প্যারিসে তার মৃত্যুর পর সেখানেই তাকে কবরস্থ করা হয়। দূর্ভাগ্যবসত ফরাসি বিপ্লবের সময় তার কবরটি বিপ্লবীদের আক্রমণে ভেঙে যাওয়ার ফলে সেই স্থানটিও এখন সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

লিওনার্দোর বিজ্ঞানের ভিত্তি ছিল তীব্র পর্যবেক্ষণ ও বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ। তার গবেষণার যন্ত্র ছিল তার চোখ। তার বিজ্ঞান সংক্রান্ত কাজগুলি তার অনুসন্ধানী অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক। লিওনার্দোর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক চিত্রগুলির মধ্যে অন্যতম ভিট্রুভিয়ান ম্যান মানবদেহের অনুপাতের একটি অনবদ্য অধ্যয়ন। শিল্প এবং বিজ্ঞানের মেরুকরণের বিপরীতে এটি একটি অসাধারণ চিত্র যেখানে একটি বৃত্তীয় ও একটি চতুস্কোন ক্ষেত্রে দুটি সমপতিত মানবদেহের হাত ও পায়ের বিভিন্ন প্রসারণ নবজাগরণের যুগের ম্যাক্রোকসমস ও মাইক্রোকসমসের ধারণাকে উপস্থাপন করে।

লিওনার্দো খাতায় প্রায় প্রতিদিনই ধারাবাহিকভাবে তার পর্যবেক্ষণ, মন্তব্য এবং পরিকল্পনার কথা লিখতেন। এছাড়াও ছিল কিছু বিভিন্ন আকারের পৃষ্ঠা। লেখা ও আঁকার জন্য তিনি বাঁ হাত বেশি ব্যবহার করতেন। তার লিখনশৈলীর বিশেষত্ব ছিল উল্টো লেখা যাকে বলা হতো মিরর স্ক্রিপ্ট। এই লেখা সাধারণভাবে পড়া খুবই অসুবিধাজনক ছিল, কিন্তু আয়নার সামনে ধরলে স্পষ্ট পড়া যেত। তার মৃত্যুর পর 1542 সাল নাগাদ তার ছাত্র মেলজি লিওনার্দোর লেখার এক-তৃতীয়াংশ প্রকাশ করার পরিকল্পনা করেন। বাকি অংশ হারিয়ে গিয়েছিল। লিওনার্দোর মৃত্যুর 165 বছর পর তার কিছু কাজ A Treatise on Painting নামে প্রকাশিত হয়।

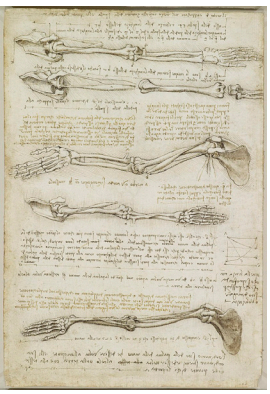
হাতের গতির পর্যবেক্ষণ

একজন গবেষক হিসেবে লিওনার্দো সৃষ্টির রহস্য উদ্ধার করতে প্রকৃতি ও ঘটনাকে সূক্ষ্মতর পর্যবেক্ষণ করেছেন, বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে সূত্র এবং সংখ্যার সাহায্যে পর্যবেক্ষণকে বিশ্লেষণ করেছেন। সাম্প্রতিককালে একজন বিজ্ঞানী হিসাবে লিওনার্দোর কাজের বিস্তৃত বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ফ্রিটজফ ক্যাপরা বলেছেন, গ্যালিলিও, নিউটন এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীরা যারা তাকে অনুসরণ করতেন তাদের থেকে মৌলিকভাবে ভিন্ন ধরণের বিজ্ঞানী ছিলেন লিওনার্দো। তিনি তত্ত্ব ও অনুমানের ভিত্তিতে বিজ্ঞান ও চিত্রকলার সমন্বয় সাধন করেছিলেন। ক্যাপরা লিওনার্দোর সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে দেখে তাকে আধুনিক সিস্টেম তত্ত্ব এবং চিন্তাধারার অগ্রদূত বলে বর্ণনা করেছেন।

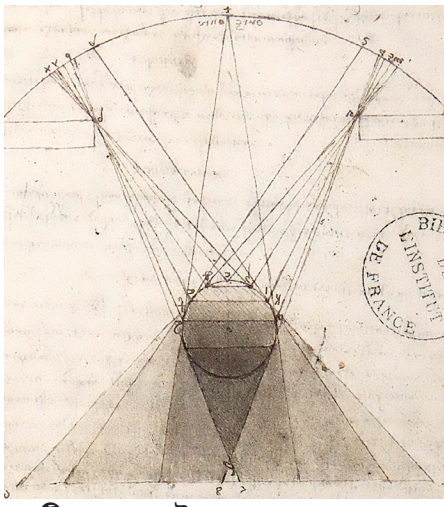
একটি গোলকের উপর আলো এবং ছায়ার ক্রমের পর্যবেক্ষণ

লিওনার্দো তার বন্ধু লুকা প্যাসিওলির লেখা শিল্পে গাণিতিক অনুপাতের উপর একটি বইতে চিত্র অলংকরণের কাজ করেছেন এবং 1509 সালে প্রকাশিত বইটির নাম ছিল “ডি ডিভিনা প্রোপোরিওন”। তিনি তার বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ এবং যান্ত্রিক উদ্ভাবনের উপরও একটি গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। এটিকে কয়েকটি পরিচ্ছদে বা “বই”-এ বিভক্ত করা হয়েছিল, পরিচ্ছদগুলির ক্রমের বিষয়েও লিওনার্দো স্পষ্ট নির্দেশিকা রেখেছিলেন। এই লেখাগুলি সাধারণত বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তু হলেও তার মধ্যে শিল্পকর্মের ছোঁয়া ছিল। এগুলি ছিল বিশদ পর্যবেক্ষণের সাথে সম্পর্কিত, বিশেষ করে প্রাকৃতিক বিশ্বের পর্যবেক্ষণ। এ প্রসঙ্গে লিওনার্দো লিখেছেন, “ফ্লোরেন্সে, 1508 সালের 22শে মার্চ তারিখে এই কাজ শুরু হয়েছিল। এই সংগ্রহ সঠিক ক্রমে নেই, কারণ লেখাগুলি আলাদা আলাদা জায়গা থেকে প্রতিলিপি করা হয়েছে। আশা করি সেগুলিকে পরবর্তীতে বিষয়বস্তু অনুযায়ী সঠিক ক্রমে সাজানো হবে। আমার মনে হয় এই কাজে কিছু বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি হতে পারে, এ বিষয়ে আমি পাঠকের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।”

আলো সম্পর্কে লিওনার্দোর পর্যবেক্ষণ ছিল যে 4 ধরণের আলো অস্বচ্ছ বস্তুকে আলোকিত করতে পারে। যেমন, বায়ুমণ্ডলের মতো বিচ্ছুরিত আলো, সরাসরি সূর্যের মতো উৎস থেকে নির্গত আলো, প্রতিফলিত আলো এবং লিনেন বা কাগজ জাতীয় অস্বচ্ছ বস্তুর মধ্য দিয়ে নির্গত আলো। 15 শতকে একজন শিল্পীর জন্য আলোর প্রকৃতি অধ্যয়ন অপরিহার্য ছিল। লিওনার্দোর ক্ষেত্রে তার পর্যবেক্ষণের সূক্ষ্মতা তার আঁকা ছবির মধ্যে এই আলো-ছায়ার খেলাকে জীবন্ত রূপ দিয়েছিল।

শারীরবিদ্যা সম্পর্কে লিওনার্দোর জ্ঞান ছিল অসীম। তিনি বলেছেন, “এ সম্পর্কে নিখুঁত জ্ঞান অর্জনের জন্য আমি দশটিরও বেশি মানবদেহ ব্যবচ্ছেদ করেছি, অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং এই শিরাগুলিকে ঘিরে থাকা মাংসের অতি ক্ষুদ্রতম কণাগুলিকে অপসারণ করেছি। যেহেতু একটি শবদেহ দীর্ঘক্ষণ রাখা

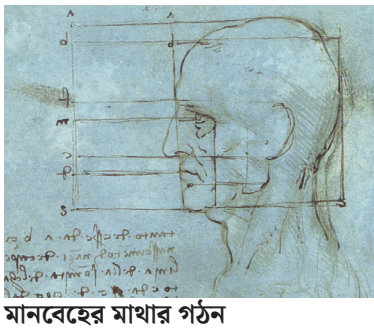
মানবেহের মাথার গঠন ও অনুপাত অধ্যয়ন

মানবদেহের গঠনগত শারীরবিদ্যা অধ্যয়ন

সম্ভব নয়, তাই বেশ কয়েকটি দেহের সাথে এই পর্যবেক্ষণ চালিয়েছি।”

লিওনার্দো শিক্ষানবিশি করার সময় থেকেই মানবদেহের গঠনগত শারীরবিদ্যা নিয়ে আনুষ্ঠানিক অধ্যয়ন শুরু করেন। একজন ছাত্র হিসাবে তিনি মানবদেহ আঁকতে জীবন্ত দেহের পেশী, টেন্ডন এবং দৃশ্যমান সাবকিউটেনিয়াস গঠন পর্যবেক্ষণ করতে এবং কঙ্কাল ও পেশী কাঠামোর বিভিন্ন অংশের যান্ত্রিক গঠন ও কার্যপদ্ধতির সাথে পরিচিত হতে শেখেন। তার প্রথমদিকের আঁকা ছবিগুলো দেখে বোঝা যায় গঠনগত শারীরবিদ্যা সম্পর্কে তার জ্ঞান অল্প বয়সেই কত গভীর ছিল। এই ক্ষেত্রে তার ক্রমাগত পর্যবেক্ষণের সাক্ষী তার নোটের বেশ কিছু পৃষ্ঠা। শরীরের গঠনগত দিকগুলির অধ্যয়নের সাথে সাথে মুখের বিভিন্ন আবেগ প্রদর্শনকারী এবং জন্মগত বা অসুস্থতার কারণে বিকৃত মুখ বিশিষ্ট লোকের চিত্র বা কিছু ব্যঙ্গচিত্রও তার প্রতিভার পরিচয় রাখে। কঙ্কালের অনুপাতের বিশ্লেষণের ভিত্তি শারীরবৃত্তীয় গবেষণা বলে মনে হয়।

একজন খ্যাত শিল্পী হিসেবে লিওনার্দোকে ফ্লোরেন্সের সান্তা মারিয়া নুওভা হাসপাতালে মানবদেহ ব্যবচ্ছেদের অনুমতি দেওয়া হয়। পরে তিনি মিলানে ম্যাগিওর হাসপাতাল এবং রোমে ওসপেডেল ডি সান্টো স্পিরিটোতে শব ব্যবচ্ছেদ করেন। 1510 থেকে 1511 সাল পর্যন্ত তিনি ডাক্তার মার্কানটোনিও ডেলা টরকে তার গবেষণায় সহযোগিতা করেছিলেন। 30 বছরে লিওনার্দো বিভিন্ন বয়সের 30টি পুরুষ ও মহিলা মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করেন। মার্কানটোনিওর সাথে তিনি শারীরবিদ্যার উপর একটি তাত্ত্বিক বই প্রকাশ করার পরিকল্পনা করেন এবং এর জন্য 200টিরও বেশি ছবি আঁকেন। পরবর্তী সময় এই বইটিই A Treatise on Painting শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল।

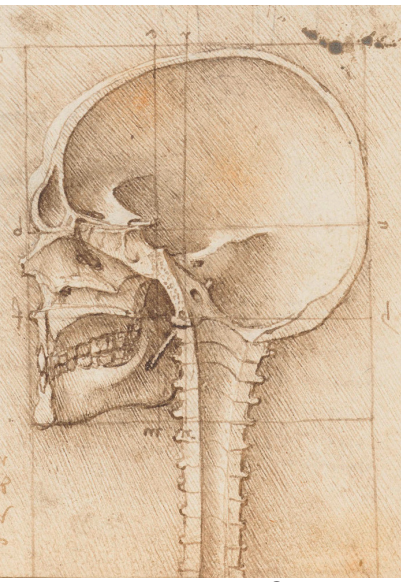

মানবদেহের খুলির ব্যবচ্ছেদ

মানব কঙ্কালের ওপর লিওনার্দোর গভীর গবেষণা ছিল। তিনিই প্রথম মেরুদণ্ডের ‘ডাবল এস’ আকৃতি বর্ণনা করেন। তিনি বলেছিলেন যে স্যাক্রাম অভিন্ন নয়, পাঁচটি মিশ্রিত কশেরুকার সমন্বয়ে গঠিত। তিনি মানুষের পায়ের গঠন এবং পায়ের সাথে এর সংযোগ নিয়েও অধ্যয়ন করেছিলেন এবং এর ফলে তিনি বায়োমেকানিক্সে যথেষ্ট বুৎপত্তি লাভ করেন। ফিজিওলজি ও অ্যানাটমি দুই বিষয়েই তার জ্ঞান ছিল অসামান্য। তিনি মানুষের মাথার খুলি এবং মস্তিষ্কের ক্রস-সেকশন, ট্রান্সভার্সাল, স্যাজিটাল এবং সামনের অংশগুলিকে ব্যবচ্ছেদ করেন ও ছবি আঁকেন। লিওনার্দোই প্রথম ব্যক্তি যিনি মানুষের এপেন্ডিক্স, ফুসফুস, মেসেন্টারি, মূত্রনালী, প্রজনন অঙ্গ, জরায়ুর পেশী এবং জনন প্রক্রিয়ার বিস্তারিত ক্রস-সেকশন আঁকেন। ভ্রূণের বৈজ্ঞানিক উপস্থাপনা আঁকাতেও তিনিই প্রথম। তিনি ভাস্কুলার সিস্টেম অধ্যয়ন করেন এবং বিশদভাবে বিচ্ছিন্ন হৃদযন্ত্রও আঁকেন। তার আঁকা নারীর অভ্যন্তরীণ বিস্তারিত অঙ্গসংস্থান সে যুগের অনেক প্রচলিত ধারণাকে ভুল বলে প্রমান করে।

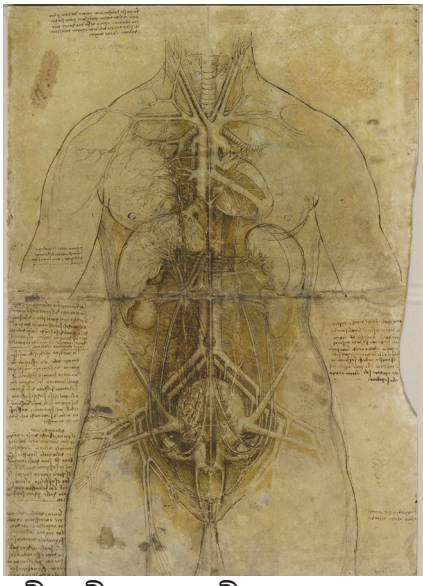

নারীর শরীরের অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ

লিওনার্দো মানুষের পাশাপাশি অন্যান্য অনেক প্রাণীর শারীরের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গঠনও অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি গরু, পাখি, বানর এবং ব্যাঙকে ব্যবচ্ছেদ করে তার আঁকায় মানুষের সাথে তাদের শারীরবৃত্তীয় কাঠামোর তুলনা করেছেন। তিনি একটি পৃষ্ঠায় একটি ঘোড়ার পাঁচটি প্রোফাইল স্টাডি আঁকেন, ক্রুদ্ধ ঘোড়ার দাঁতের অভিব্যক্তির সাথে ক্রুদ্ধ সিংহ ও মানুষের দাঁতের তুলনাও দেখান। তার মতে মানুষের তুলনায় অন্য প্রাণীদের দেহের জ্ঞানেন্দ্রেয় অনেক বেশি সক্রিয়। তিনি ভালুকের গঠনগত শারীরবিদ্যা বিশদভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। শারীরবিদ্যা বিষয়ে তার আঁকাগুলির মধ্যে অন্যতম গর্ভবতী গাভীর জরায়ু, ক্ষয়প্রাপ্ত খচ্চরের পশ্চাৎপদ এবং ছোট কুকুরের পেশীর অধ্যয়ন।

লিওনার্দোর চোখে মানব ভ্রূণ

উদ্ভিদবিদ্যার বিষয়ে লিওনার্দোর নোটবুকে অনেক বিশদ অঙ্কন পাওয়া যায়। একজন শিল্পী এবং পর্যবেক্ষক হিসাবে উদ্ভিদের সুনির্দিষ্ট চেহারা, বৃদ্ধির পদ্ধতি এবং উপায় তিনি নথিবদ্ধ করেন। ফুল ছাড়াও তার নোটবুকে শস্যজাতীয় গাছেরও অনেক চিত্র পাওয়া গেছে। লিওনার্দোর মতে একটি গাছের উচ্চতার প্রতিটি স্তরে সমস্ত শাখার একত্র পরিধি কাণ্ডের পরিধির সমান হয়।

লিওনার্দোর ভূতাত্ত্বিক গঠনের জ্ঞানও ছিল অসীম। তার প্রথম দিকের

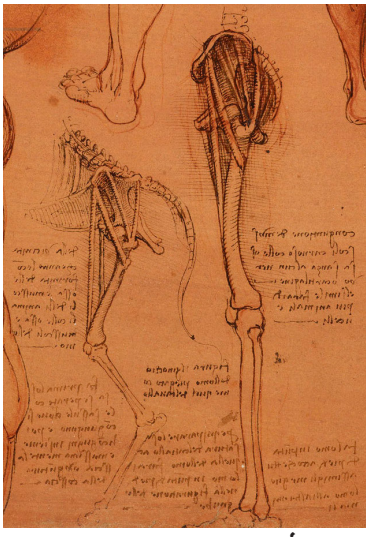

মানুষ এবং কুকুরের পায়ের গঠনের তুলনা

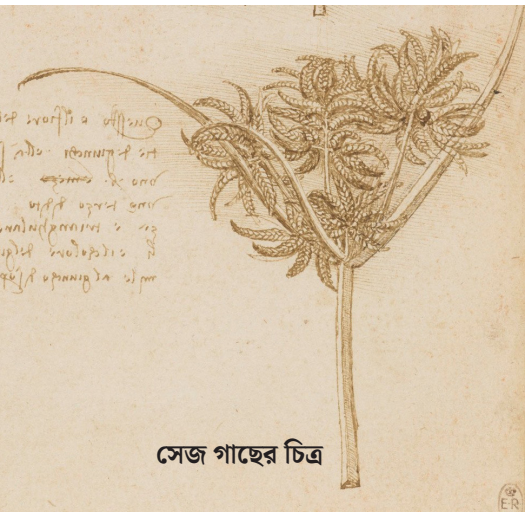
সেজ গাছের চিত্র

আঁকা আর্নো উপত্যকার মানচিত্র এর ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। লিওনার্দোর নোটবুকে ফ্লোরেন্স এবং মিলান উভয় অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণের সমৃদ্ধ ল্যান্ডস্কেপ রয়েছে, যার মধ্যে বায়ুমণ্ডলীয় প্রভাব, পাহাড়ের পাদদেশের ভারী বৃষ্টিপাত প্রভৃতি লক্ষ্যণীয়। বহু বছর ধরে পাহাড়ের স্তরে প্রায়শই সামুদ্রিক প্রাণীর দেহাবশেষ দেখা যেত। তৎকালীন রক্ষণশীল বিজ্ঞান এগুলোকে বাইবেলে বর্ণিত মহাপ্লাবনের ফল হিসাবে দেখতো। লিওনার্দোর পর্যবেক্ষণ প্রথম এই প্রচলিত ধারণাই আঘাত হানে। তার মতে সময় সময় সমুদ্রতল উত্থিত হয়ে সামুদ্রিক জীবেরা এখানে জড়ো হয় এবং পরে পাললিক শীলায় আবদ্ধ হয়। এর থেকে ভূতত্ত্ব সম্পর্কে লিওনার্দোর জ্ঞানের প্রশস্ততা বোঝা যায়, পাললিক শিলা তৈরিতে জলের ক্রিয়া, সমুদ্রের তল পরিবর্তনে পৃথিবীর টেকটোনিক ক্রিয়া এবং ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য তৈরিতে ক্ষয়ের ক্রিয়া সম্পর্কে তার সুস্পষ্ট ধারণা ছিল।

16 শতকের গোড়ার দিকে মানচিত্র ছিল বিরল এবং যা ছিল সবই প্রায় ত্রুটিপূর্ণ। লিওনার্দো 1502 সালে ইমোলার শহর পরিকল্পনার জন্য ত্রুটিহীন মানচিত্র তৈরি করেছিলেন। তিনি আধুনিক সরঞ্জামের সুবিধা ছাড়াই জরিপ করে তাসকানির চিয়ানা উপত্যকারও একটি মানচিত্র তৈরি করেন। 1515 সালে লিওনার্দো রোমান দক্ষিণ উপকূলের একটি মানচিত্র তৈরি করেছিলেন যা ছিল জলাভূমি নিষ্কাশনের পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত এবং ভ্যাটিকানের জন্য তার কাজের সাথে যুক্ত।

হাইড্রোডাইনামিক্স ছিল লিওনার্দোর চর্চা করা বিষয়গুলির অন্যতম। তার মতে জলপ্রবাহের প্রতিটি পর্যায়ে তার সমস্ত শাখা যদি সমান গতিসম্পন্ন হয় তবে তার মিলিত পরিমান মূল স্রোতের সমান। লিওনার্দোর আঁকা অনেক ছবির মধ্যে জলের গতির অধ্যয়ন, বিশেষ করে বিভিন্ন পৃষ্ঠে দ্রুত প্রবাহিত জল দ্বারা গৃহীত রূপগুলি স্পষ্ট। এর মধ্যে অনেকগুলি জলের সর্পিল প্রকৃতিকে চিত্রিত করেছে। লিওনার্দোর বিশেষ আগ্রহ ছিল স্রোত এবং নদীর চিত্র, ক্ষয়প্রাপ্ত শিলাগুলিতে জলের ক্রিয়া, বন্যা এবং জোয়ারের তরঙ্গে জলের বিপর্যয়মূলক ক্রিয়াতে। এই অধ্যয়ন থেকে যে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন তিনি তা বিভিন্ন প্রকল্পে বিশেষ করে আর্নো নদীর সাথে সম্পর্কিত প্রকল্প তৈরিতে প্রয়োগ করেন।

একটি টপোগ্রাফিক্যাল মানচিত্র

লিওনার্দোর আঁকা ইমোলার নির্ভুল মানচিত্র

লিওনার্দোর সময়কালে পৃথিবী এবং সূর্যের গতিবিধির ব্যাখ্যা ছিল ভূকেন্দ্রিক তত্ত্বনির্ভর। তিনি লিখেছিলেন যে "সূর্যের পদার্থ, আকৃতি, গতিবিধি, তেজ, তাপ এবং উৎপন্ন শক্তি রয়েছে; এবং এই সমস্ত গুণাবলী তার হ্রাস ছাড়াই নিজের থেকে নির্গত হয়।" তিনি আরও লিখেছেন, "পৃথিবী সূর্যের কক্ষপথের কেন্দ্রে বা মহাবিশ্বের কেন্দ্রে নয়।" তার একটি নোটবুকে, মার্জিনে একটি নোট রয়েছে যেখানে বলা হয়েছে, "সূর্য নড়ে না" যা লিওনার্দোর সূর্যকেন্দ্রিকতার প্রতি সমর্থন বোঝায়।

কেউ কেউ দাবি করেন যে লিওনার্দো দা ভিঞ্চি একজন আলকেমিস্ট ছিলেন। লিওনার্দো এতটাই দক্ষ রসায়নবিদ ছিলেন যে তিনি পেইন্ট পিগমেন্ট স্থায়ী করার জন্য বিভিন্ন মাধ্যমে সেগুলি প্রয়োগের পরীক্ষা করেছিলেন। লিওনার্দোর শৈল্পিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে নোটের অনেক পৃষ্ঠায় শিল্পকর্মে রৌপ্য এবং সোনার ব্যবহার সম্পর্কিত কিছু তথ্য পাওয়া যায়। লিওনার্দোর বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া মূলত পর্যবেক্ষণভিত্তিক ছিল। তিনি আলকেমিস্টদের সম্পর্কে বলেছিলেন, "প্রকৃতির ভুল ব্যাখ্যাকারীরা বলে যে কুইকসিলভার হল প্রতিটি ধাতুর সাধারণ বীজ, কিন্তু বাস্তবে প্রকৃতি যে জিনিস তৈরি করতে চায় তার বৈচিত্র অনুসারে বীজেরও পরিবর্তন করে। পুরানো অ্যালকেমিস্টরা কখনোই দৈবক্রমে বা পরীক্ষা দ্বারা প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট ক্ষুদ্রতম উপাদান তৈরিতে সফল হননি। তারা মানুষের ব্যবহারের জন্য উদ্ভাবিত জিনিসগুলির উপযোগিতার জন্য অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য, কিন্তু যদি তারা বিষ এবং জীবন বা মনকে ধ্বংস করে এমন অন্যান্য অনুরূপ জিনিসের উদ্ভাবক না হতো তাহলে আরও বেশি প্রশংসার যোগ্য হতো। এদের অনেকে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে এবং মিথ্যা অলৌকিকতার ব্যবসা করে মূর্খ জনতাকে প্রতারিত করেছে।"

গণিতের জগতে লিওনার্দোর উৎসাহ ও কাজের কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। গণিতের অন্যান্য শাখার সাথে জ্যামিতিতে ছিল তার অসীম আগ্রহ। তার মতে, "বিন্দু একটি অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি এবং এর উচ্চতা, প্রস্থ, দৈর্ঘ্য বা গভীরতা নেই, যেখান থেকে এটিকে অবিভাজ্য হিসাবে বিবেচনা করা যায় এবং মহাবিশ্বে এর কোন মাত্রা নেই।"

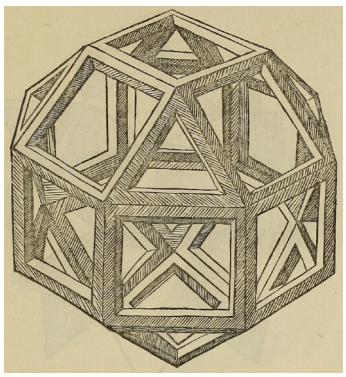
ডি ডিভিনা প্রোপোরিওনে প্রকাশিত রম্বিকিউবোক্টাহেড্রন

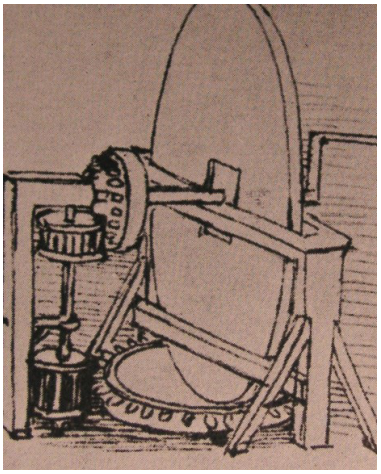

লিওনার্দো পরিকল্পিত ঘর্ষণের মাধ্যমে কাঁচ থেকে উত্তল লেন্স তৈরির যন্ত্র

বিখ্যাত ইতালীয় চিত্রকর ও বাস্তুকার ভাসারি তার দ্য লাইভস-এ লিওনার্দো সম্পর্কে বলেছেন, "তিনি মিল, ফুলিং মেশিন এবং ইঞ্জিনের জন্য নকশা তৈরি করেছিলেন যেগুলি জল-শক্তি দ্বারা চালিত হতে পারে। উপরন্তু তিনি মডেল তৈরি করে দেখান কিভাবে পাহাড়ের মধ্য দিয়ে কোন অসুবিধা ছাড়াই সুড়ঙ্গ খনন করা যায়; কিভাবে লিভার, উত্তোলক যন্ত্র এবং উইঞ্চের মাধ্যমে বড় ওজন তুলতে পারা যায়; বন্দর পরিষ্কার করার উপায় এবং গভীর জলাধার থেকে পাম্প ব্যবহার করে কিভাবে জল নিষ্কাশন করা যায়।"

শারীরবৃত্তীয় গবেষণার মতো যন্ত্রের যন্ত্রাংশ সংস্থানেও তিনি একইরকম যুক্তিবাদী এবং বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি ব্যবহার করতেন। লিওনার্দো বিস্ময়করভাবে বহু সংখ্যক মেশিন এবং ডিভাইসের নকশা তৈরী করেন। আধুনিক প্রযুক্তিগত অঙ্কনের প্রথম রূপ তৈরি করেন লিওনার্দো। যন্ত্রের অভ্যন্তরীণ উপাদানগুলিকে উপস্থাপন করার জন্য একটি নিখুঁত "বিস্ফোরিত দৃশ্য" অঙ্কন ছিল তার বিশেষত্ব। তার আঁকা এই যান্ত্রিক ছবিগুলি পাঁচ হাজারেরও বেশি পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে আছে। যান্ত্রিক নীতির বিষয়ে তার বুৎপত্তি ছিল অপরিসীম। লিভারেজ এবং ক্যান্টিলিভারিং, পুলি, ক্র্যাঙ্ক, গিয়ার, অ্যাঙ্গেল-গিয়ার এবং রেক-ও-পিনিয়ন-গিয়ার, সমান্তরাল সংযোগ, তৈলাক্তকরণ সিস্টেম এবং বিয়ারিং-এর ব্যবহার তার আঁকায় চোখে পড়ার মতো। তিনি গতিবেগ, কেন্দ্রিক বল, ঘর্ষণ এবং অ্যারোফয়েল নিয়ন্ত্রণকারী নীতিগুলি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখতেন।

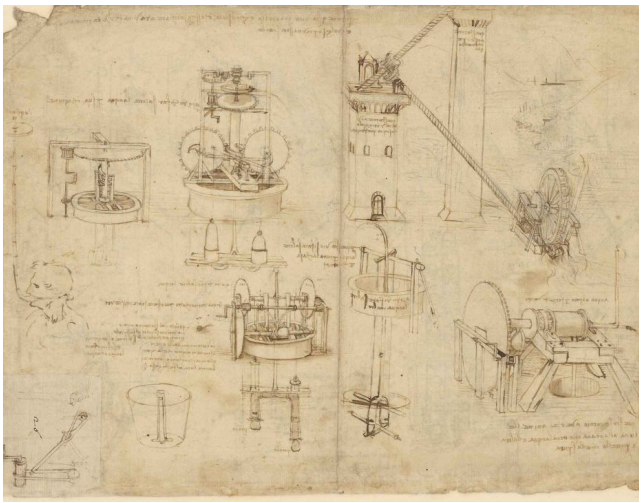

লিওনার্দো পরিকল্পিত বিভিন্ন হাইড্রোলিক যন্ত্র

লিওনার্দোর আবিষ্কৃত কত যন্ত্র সেযুগে ব্যবহারিকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল বা জনজীবনে প্রভাব ফেলেছিল সেকথা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। তবে যে উদ্ভাবনগুলিকে সাধারণ ব্যবহারিক প্রয়োগের কৃতিত্ব দেওয়া হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্ট্রট ব্রিজ, স্বয়ংক্রিয় ববিন উইন্ডার, রোলিং মিল, তারের প্রসার্য শক্তি পরীক্ষা করার জন্য মেশিন এবং লেন্স-গ্রাইন্ডিং মেশিন। তবে একজন উদ্ভাবক হিসাবে লিওনার্দো যা আবিষ্কার করেন তার সবকিছু তিনি লিখে যান নি। তার ভয় ছিল, এই প্রযুক্তিগুলি ক্ষমতালোভী মানুষের হাতে পড়লে তা মানবসভ্যতার জন্য কল্যাণকারী হবেনা।

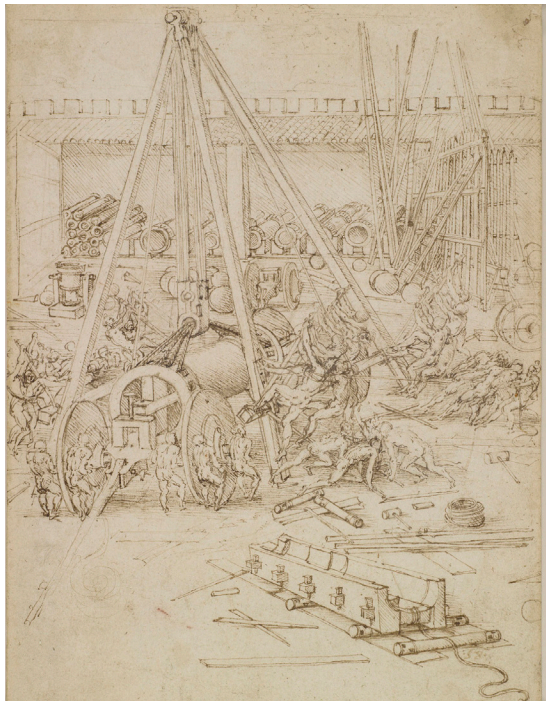

লিওনার্দো পরিকল্পিত যুদ্ধাস্ত্রের নকশা

লিওনার্দো জলের গতির অধ্যয়ন করে এমন যন্ত্রপাতি ডিজাইন করেছিলেন যা প্রবাহিত জলের শক্তিতে চালিত। লিওনার্দোর অন্যতম আবিষ্কার ছিল টেকসই হালকা বহনযোগ্য সেতু। ফ্লোরেন্সে তাঁর প্রকল্পগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল পিসাকে বন্যার জন্য আর্নোর গতিপথ পরিবর্তন। তিনি ভেনিস জরিপও করেছিলেন এবং আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে শহরের সুরক্ষার জন্য একটি চলমান ডাইক তৈরি করার পরিকল্পনা করেছিলেন।

1502 সালে লিওনার্দো ইস্তাম্বুলের অটোমান সুলতান দ্বিতীয় বেয়াজিদের জন্য একটি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রকল্পের অংশ হিসাবে 240 মিটার (720 ফুট) দীর্ঘ সেতুর একটি একক স্প্যান তৈরি করেছিলেন। প্রকল্পটি সেইসময় অনুমোদন পায় নি, কিন্তু 2001 সালে নরওয়েতে তার নকশার উপর ভিত্তি করে একটি ছোট সেতু সফলভাবে নির্মিত হয়েছিল। লিওনার্দোর নোটবুকগুলিতে যুদ্ধের জন্য নানারকম যন্ত্রের ড্রয়িং রয়েছে যার মধ্যে একটি যান রয়েছে যা দুটি লোক ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্টকে চালিত করে। যদিও অঙ্কনটি সম্পূর্ণ ছিল, তবে গতিবিদ্যার দৃষ্টিকোণে এটি ছিল ত্রুটিপূর্ণ। কারণ আঁকাটি সম্পূর্ণ অনুসরণ করে যদি যন্ত্রটি তৈরী করা যায়, যানটি কখনই সামনের দিকে অগ্রসর হবে না। পরবর্তী সময়ে একটি সামরিক দল গিয়ারে কিছু পরিবর্তন করে মেশিনটি তৈরি করেছিল এবং মেশিনটি সঠিকভাবেই কাজ করেছিল। মনে হয়, লিওনার্দো ইচ্ছাকৃতভাবে নকশায় এই ত্রুটিটি রেখেছিলেন, যাতে অননুমোদিত ব্যক্তিদের হাতে পরে এর অপপ্রয়োগ না হয়। লিওনার্দোর নোটবুকে এমন কামাননের নকশা দেখা যায় যা তিনি দাবি করেছিলেন যে "এগুলির ধোঁয়া দিয়ে ঝড়ের মতো ছোট ছোট পাথর নিক্ষেপ করে শত্রুদের

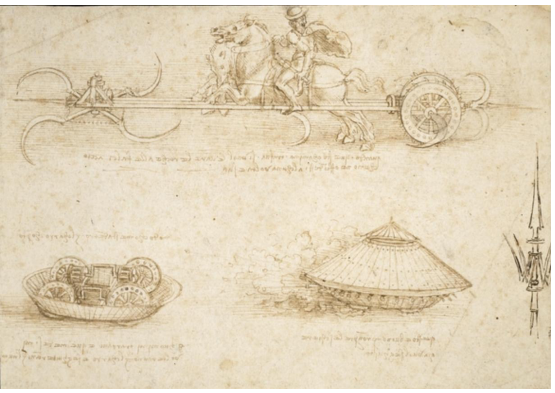

লিওনার্দো পরিকল্পিত যুদ্ধযানের নকশা

মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে প্রচুর ক্ষতি এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা সম্ভব।" এরকমই অদ্ভুত ছিল তার করা কিছু যুদ্ধযানের নকশা।

লিওনার্দোই প্রথম হুইল-লক মাস্কেটের স্কেচ করেছিলেন। 1547 সালে ইউরোপে প্রথম ফ্লিন্টলক মাস্কেটের নজির দেখা যায়, যদিও 14 শতকের গোড়ার দিকে চিনে ল্যান্ড মাইন বিস্ফোরণ করার জন্য একটি ফ্লিন্টলক 'স্টিল হুইল' ব্যবহার করার নজির ছিল। লিওনার্দো যখন ভেনিসে কাজ করছিলেন, তখন তিনি ডাইভিং স্যুটের একটি স্কেচ আঁকেন, যা ভেনিসীয় জলসীমায় প্রবেশকারী শত্রু জাহাজকে ধ্বংস করার জন্য পরিকল্পিত ছিল। পরবর্তী সময়ে এইরকম একটি স্যুট তৈরি করা হয় শূকরের চামড়া দিয়ে এবং মাছের তেল ব্যবহার করা হয় এটিকে জল থেকে বাঁচাবার জন্য। সামনের দিকে দুটি চশমা যুক্ত হেলমেট ছিল মাথা ঢাকার জন্য। পিগস্কিন জয়েন্ট সহ বাঁশের একটি শ্বাস-প্রশ্বাসের নল হেলমেটের পিছনে সংযুক্ত ছিল। যখন স্কুবা ডাইভাররা স্যুটটি পরীক্ষা করে, তারা এটিকে আধুনিক ডাইভিং স্যুটের একটি কার্যকর প্রাথমিক সংস্করণ বলে অভিহিত করে।

লিওনার্দো শৈশবে একটি বাজপাখি দেখে পাখিটির বাতাসে ভেসে থাকার কৌশল বুঝতে পেরেছিলেন। পরে এ সম্পর্কে তার আরো বিশদ পর্যবেক্ষণে ধরা পরে, একটি বস্তু বায়ুকে ততটাই প্রতিরোধ করে যতটা বায়ু বস্তুকে করে। বাতাসের বিরুদ্ধে ডানার আঘাত একটি ভারী ঈগলকে আকাশের সর্বোচ্চ উচ্চতায় উড়তে সহায়তা করে। আবার সমুদ্রের উপর গতিশীল বায়ুকে কাজে লাগিয়ে পালের সাহায্যে ভারী জাহাজ সহজে

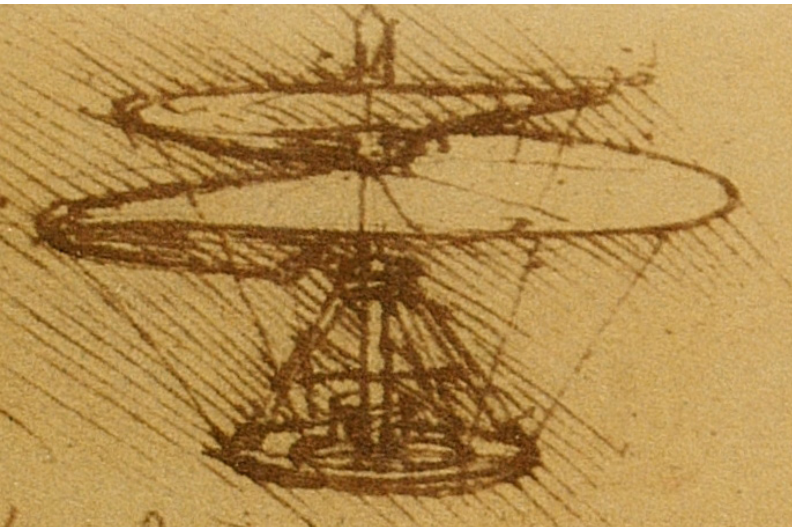

লিওনার্দোর নকশা করা উড়ন্ত মেশিন

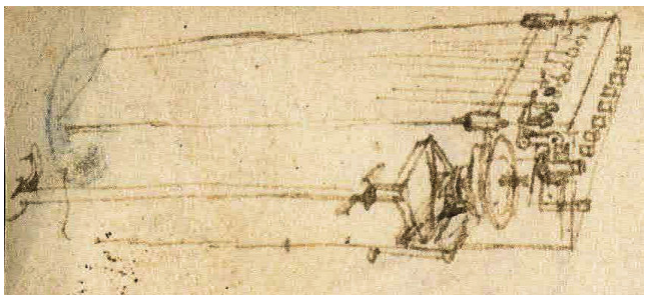

লিওনার্দোর ভায়োলা অর্গানস্তা

চলতে পারে। এইসব পর্যবেক্ষণ বিশ্লেষণ করে তিনি বুঝতে পারেন যথোপযুক্ত বড় ডানা যথাযথভাবে সংযুক্ত হলে একজন মানুষও বাতাসের প্রতিরোধকে জয় করে উপরে উঠতে সফল হতে পারে। তার পরবর্তী সময়ের জার্নালগুলিতে পাখির উড়ানের এবং বাদুড়ের কাঠামোর উপর ভিত্তি করে ডানার জন্য বিভিন্ন নকশা রয়েছে। ঝিল্লির দুর্ভেদ্য প্রকৃতির কারণে এই ডানা হালকা ছিল। তার একটি নকশায় এমন একটি উড়ন্ত মেশিন দেখা যায় যা মানুষ চালিত রোটারের সাহায্যে ওড়ানো সম্ভব। তিনি অনেকগুলি মানুষ চালিত উড়ন্ত মেশিন ডিজাইন করেছিলেন, তিনি একটি প্যারাসুট এবং একটি হালকা হ্যাং গ্লাইডারও ডিজাইন করেছিলেন যা উড়তে পারত।

ভায়োলা অর্গানস্তা লিওনার্দো দা ভিঞ্চি দ্বারা উদ্ভাবিত একটি পরীক্ষামূলক বাদ্যযন্ত্র। এটি ছিল প্রথম ছরটানা কীবোর্ড জাতীয় যন্ত্র। তার 1488–1489 সালের নোটবুকগুলিতে এই যন্ত্র সম্পর্কে যে নকশা পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় এতে একটি বা একাধিক চাকা ব্যবহার করে ক্রমাগত ছর টানা হতো এবং যন্ত্রের তারগুলি ছরের সাথে লম্ব অবস্থায় থাকতো।

বিংশ শতকের শেষের দিকে লিওনার্দোর আবিষ্কারের প্রতি লোকের আগ্রহ বাড়তে থাকে। তার চিত্রিত নক্সাগুলিকে কার্যকরী মডেলে পরিণত করার চেষ্টা চলতে থাকে নানা জায়গায়। বিজ্ঞানপ্রেমীরা মনে করতে থাকেন, যদি 15 এবং 16 শতকে সীমিত সুযোগ ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে লিওনার্দো এইসব যন্ত্রের কল্পনা করতে পারেন, আধুনিক উন্নত প্রযুক্তিতে হালকা ওজনের বেশ কয়েকটি শক্তিশালী উপকরণ ব্যবহার করে লিওনার্দোর ডিজাইনকে বাস্তবে পরিণত করা সম্ভব। বিশেষ করে উড়ন্ত মেশিনের জন্য তার নকশার ক্ষেত্রে সবার কৌতূহল দেখা যায়। মডেল তৈরির ক্ষেত্রে যে প্রধান অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় তা হলো প্রায়শই লিওনার্দো একটি মেশিনের যান্ত্রিকতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নকশা উপস্থাপন করেন নি, বরং বলা যায় তিনি এক ধরণের গ্রাফিক শর্টহ্যান্ড ব্যবহার করেছিলেন। যান্ত্রিক বিবরণের পরিমার্জনার এই অভাব যথেষ্ট বিভ্রান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এইভাবে, অনেক মডেল তৈরি করা হয়েছে, যেগুলো নকশা অনুযায়ী তৈরী করলে কাজ করে না, কিন্তু সামান্য যান্ত্রিক পরিমার্জনের সাথে অত্যন্ত ভালোভাবে কাজ করে। স্বল্প পরিসরে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ লিওনার্দো সম্পর্কে যেটুকু আলোচনা করা গেল, বাকি রয়ে গেল তার থেকেও অনেক বেশি। পরে কখনো সুযোগ পেলে তখন নয় বাকিটুকুও বলা যাবে।

*লেখক **শ্রী অমিতেশ ব্যানার্জী** বিজ্ঞানকর্মী ও এই পত্রিকার সাথে যুক্ত। ইমেল: amiteshbanerjee1@gmail.com*

জাতীয় বিজ্ঞান দিবস উদযাপন

মানস মৌলিক

28শে ফেব্রুয়ারী দেশব্যাপী পালিত হলো জাতীয় বিজ্ঞান দিবস। জাতীয় জীবনে দিনটির গুরুত্ব অপরিসীম। আমরা সবাই জানি, 1928 সালের এই দিনটিতেই সি ভি রামন তার বিখ্যাত রামন এফেক্ট আবিষ্কার করেন এবং এই আবিষ্কারের স্বীকৃতি রূপে 1930 সালে তিনি পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এটি ছিল সমগ্র এশিয়ার মধ্যে বিজ্ঞানের কোনো শাখায় প্রথম নোবেল পুরস্কার। সুতরাং সেই দিক থেকে এবং অবশ্যই বিজ্ঞানের জয়যাত্রার রাজপথে 28শে ফেব্রুয়ারী দিনটি একটি মাইলফলক। প্রতি বছরই দেশব্যাপী এই দিনটি পালিত হয় দেশে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান সচেতনতা ও বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসার ঘটাবার লক্ষে। প্রতি বছর নতুন নতুন ভাবনাকে সামনে রেখে দেশের বিজ্ঞানীমহল, বিজ্ঞান সঞ্চারক গোষ্ঠী ও বিজ্ঞানমনস্ক নাগরিকরা উদ্বুদ্ধ হন জনসাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক মেজাজের উন্মেষ ঘটাতে। এবছর “বিকশিত ভারতের জন্য স্বদেশী প্রযুক্তি” ভাবনাকে সামনে রেখে পালিত হলো এই দিনটি।

অন্যান্য বছরের মতো এবারও শান্তি ফাউন্ডেশন ও রহড়ার রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকেনান্দ শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে দিনটি পালিত হয় মহাবিদ্যায়লয়ের মা সারদা হলে। অনুষ্ঠানের সূচনায় স্বাগত ভাষণে মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ স্বামী কমলাস্থানন্দজী সকলকে আন্তরিক আহ্বান জানান এই দিনটি পালনের জন্য। দেশে বিজ্ঞানের প্রচার ও বিজ্ঞানমনস্কতা জাগিয়ে তোলার কাজে শান্তি ফাউন্ডেশনের নিরবিচ্ছিন্ন প্রয়াসের কথা তুলে ধরেন উপস্থিত সুধীবৃন্দের সামনে। প্রশংসা করেন আর্থিকভাবে পিছিয়ে পরা মেধাবী ছাত্রদের সহযোগিতার জন্য শান্তি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগকে।

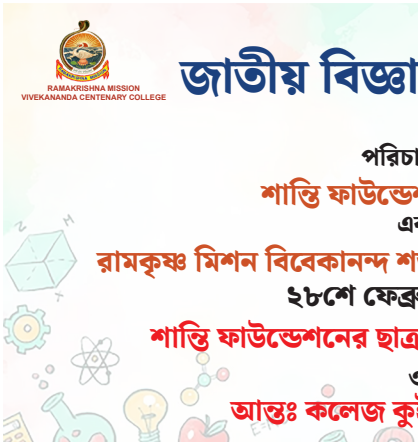

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি, শান্তি ফাউন্ডেশনের কর্মাধ্যক্ষ ডঃ নকুল পারাশর তার ভাষণে বর্তমান যুগে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীতার করা তুলে ধরেন। আলোচনা করেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা জাতীয় প্রযুক্তির বিপুল সম্ভাবনার কথা। ছাত্রদের উদ্দীপিত করতে তিনি বলেন ছাত্রজীবনে গভীর জ্ঞানের সন্ধানের মধ্যেই ভবিষ্যতে সমাজের চাহিদা পূরণের ও মানবকল্যাণের মূল সূত্র লুকিয়ে আছে। তিনি মহাবিদ্যালয়ের গৌরবময় ঐতিহ্য এবং এই প্রতিষ্ঠানের সাথে তার দীর্ঘদিনের সংযোগেরও উল্লেখ করেন। ভবিষ্যতে ছাত্র সহায়তা প্রকল্পের কথাও তিনি ঘোষণা করেন।

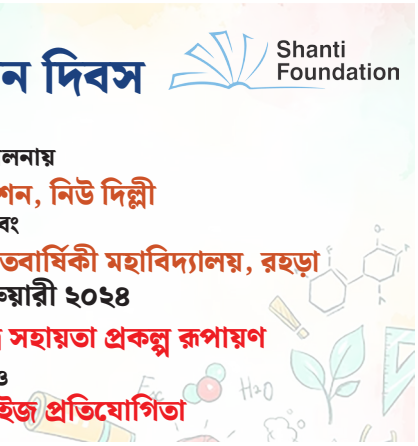

অনুষ্ঠানের পরবর্তী পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষায় উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের জন্য দশজন ছাত্রকে পুরস্কৃত করা হয় **শান্তি দেবী সেরা বিজ্ঞান ছাত্র পুরস্কার**-এ। এরা হলেন, শুভদীপ জানা, পুষ্পেন্দু মান্না, রুদ্র নারায়ণ পাত্র, রমাব্রত ঘোষ, শুভদীপ মন্ডল, সুজয় সেন, সায়ন কাঁড়ার, ভাস্কর দাস, রূপক গায়েন, এবং চয়ন গিরি। বিজ্ঞান শিক্ষনে অসামান্য অবদানের জন্য **শান্তি দেবী সেরা বিজ্ঞান শিক্ষক পুরস্কার**-এ পুরস্কৃত করা হয় অধ্যাপক ডঃ কুমার রণবীর সুরকে। দীর্ঘ দিন ধরে বিজ্ঞান শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের জন্য শান্তি ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে **শান্তি দেবী বিশিষ্ট বিজ্ঞান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান**-এর সম্মান দেওয়া হয় রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়কে। শান্তি ফাউন্ডেশন বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ে আই টি ল্যাব গড়ে তোলার যে সহায়তা প্রকল্প চালু করেছে তার সূচনায় মহাবিদ্যালয়কে দুটি ল্যাপটপ দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে ছিল আন্তঃ মহাবিদ্যালয় বিজ্ঞান কুইজ প্রতিযোগিতা। বিভিন্ন কলেজের 20 জন ছাত্র পাঁচটি দলে বিভক্ত হয়ে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। দলগুলির নাম ছিল আর্যভট্ট, জে সি বোস, পি সি রায়, এস এন বোস এবং এম এন সাহা দল। প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে পি সি রায় দল। এই দলের সদস্য ছিলেন দর্পন চক্রবর্তী, রাজিৎ দত্ত, তীর্থঙ্কর রায় এবং সুদীপ্ত পাল। ●

লেখক ***ডঃ মানস মৌলিক*** *বিরামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক।*
ইমেল: Rkmvccollege@rkmvccrahara.org

বিশ্ব আবহাওয়া দিবস
আবহাওয়া বিজ্ঞানের উপলব্ধি

নকুল পারাশর

প্রতি বছর 23শে মার্চ, বিশ্বজুড়ে আবহাওয়াবিদ এবং উৎসাহী পরিবেশপ্রেমীরা বিশ্ব আবহাওয়া দিবস উদযাপন করেন। 1950 সালের এই দিনে বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (WMO)-এর প্রতিষ্ঠার স্মরণ করে আবহাওয়া, জলবায়ু এবং পরিবেশ সম্পর্কে আমাদের আরো সচেতন করে তোলার উদ্দেশ্যে এই দিনটি পালিত হয়। আবহাওয়া সম্পর্কিত প্রাকৃতিক ঘটনার পূর্বাভাস দেওয়া থেকে শুরু করে দীর্ঘমেয়াদী জলবায়ু অধ্যয়ন বা জীবন ও জীবিকা রক্ষায়, টেকসই উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে আবহাওয়াবিজ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

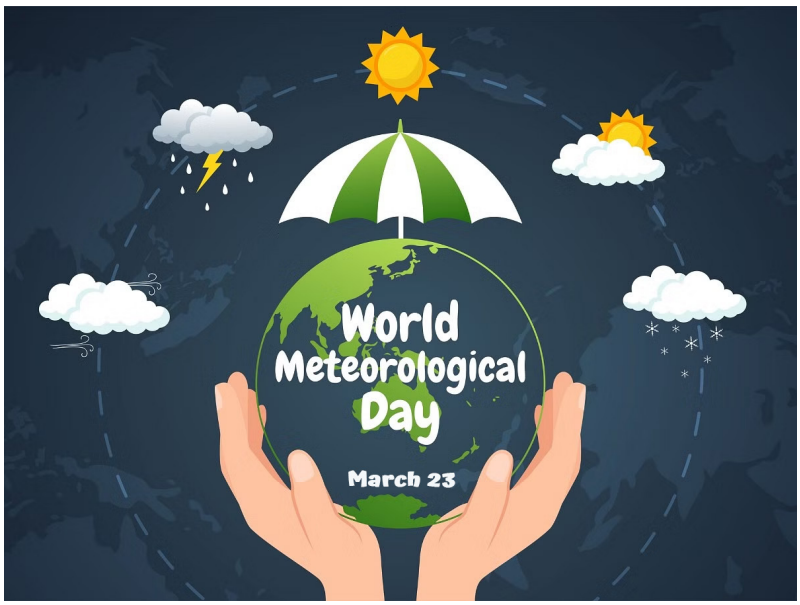

এবছরের বিশ্ব আবহাওয়া দিবস-এর থিম ছিল "Weather-Ready, Climate-Smart"। জলবায়ুর ধারাবাহিক পরিবর্তনের ফলে আজ বিশ্বব্যাপী নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে চলেছে। সাথে আছে বিশ্ব উষ্ণায়ন, যার ফল স্বরূপ ঘটে চলেছে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা এবং তাপপ্রবাহ—বিশ্বব্যাপী সকল বাস্তুতন্ত্র আজ গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। আবহাওয়ার স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি করে এবং জলবায়ু-বান্ধব এমন অভ্যাসগুলি আমাদের জীবনে অনুশীলনের মাধ্যমেই আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ ঘটনাগুলির সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকি কমাতে পারি এবং আগামী প্রজন্মের জন্য আরও টেকসই ভবিষ্যত গড়ে তুলতে পারি।

আবহাওয়াবিদ্যার মূল কথা হল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল এবং আবহাওয়ার ধরণ, বায়ুমণ্ডলীয় অবস্থা এবং জলবায়ু গতিবিদ্যা প্রভৃতি ঘটনাগুলির বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন। আবহাওয়াবিদরা আবহাওয়া এবং জলবায়ুর পরিবর্তনগুলি নিরীক্ষণ করার এবং ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য উপগ্রহ এবং রাডার ব্যবস্থা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের কম্পিউটার মডেল এবং স্থল-ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ কৌশল প্রয়োগ করেন।

আবহাওয়ার পূর্বাভাস আবহাওয়াবিদ্যার একটি মৌলিক দিক, ভবিষ্যতের আবহাওয়ার পরিস্থিতি সম্পর্কে সঠিকভাবে পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য আবহাওয়াগত তথ্য বিশ্লেষণ অত্যন্ত জরুরি। বায়ুর ভর, চাপ ব্যবস্থা, তাপমাত্রা ওঠা-নামা এবং আর্দ্রতার মাত্রার মধ্যে পারস্পরিক জটিল সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে আবহাওয়াবিদরা সময়োপযোগী সতর্কতা এবং পরামর্শ জারি করে ব্যক্তি ও জনগোষ্ঠীকে আসন্ন আবহাওয়ার বিপদের জন্য প্রস্তুত করতে সাহায্য করেন। শীতকালীন ঝড়, টর্নেডোর প্রাদুর্ভাব বা গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়– যাই হোক না কেন, সঠিক পূর্বাভাস আসন্ন বিপদের হাত থেকে মানুষের জীবন বাঁচাতে পারে এবং এইসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের আর্থ-সামাজিক ক্ষতিকে কমিয়ে আনতে পারে।

স্বল্পমেয়াদী আবহাওয়ার পূর্বাভাস ছাড়াও আবহাওয়াবিদরা দীর্ঘমেয়াদী জলবায়ু প্রবণতা এবং জলবায়ুর পরিবর্তনশীলতাও অধ্যয়ন করেন। ঐতিহাসিক জলবায়ু তথ্য বিশ্লেষণ থেকে শুরু করে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণগুলিকে জানা এবং বাস্তুতন্ত্র, অর্থনীতি এবং মানব সমাজের উপর এর প্রভাবের মূল্যায়ন পর্যন্ত সবকিছুই জলবায়ু বিজ্ঞান গবেষণার অন্তর্ভুক্ত। পরিশীলিত জলবায়ু মডেল এবং পর্যবেক্ষণমূলক অধ্যয়নের মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা জলবায়ু পরিবর্তনশীলতার অন্তর্নিহিত কারণগুলিকে আরও ভালভাবে বুঝতে পারেন এবং তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, সমুদ্রপৃষ্ঠ এবং অন্যান্য জলবায়ু পরিবর্তনের পূর্বাভাস দিতে পারেন।

আমাদের সমাজে ও জীবনে আবহাওয়াবিদ্যার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। কৃষি বা পরিবহন থেকে শুরু করে জনস্বাস্থ্য এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পর্যন্ত সবকিছুকেই প্রভাবিত করে আবহাওয়াবিদ্যা। সঠিক আবহাওয়ার পূর্বাভাস এবং জলবায়ু সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করে আবহাওয়াবিদরা কৃষকদের ফসলের সর্বাধিক ফলন পেতে সাহায্য করেন, বিমান চলাচলের পথ পরিকল্পনা করেন এবং তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে নীতিনির্ধারকরা জলবায়ু অভিযোজন নীতি প্রণয়ন করেন। জলসম্পদ ব্যবস্থাপনা, শক্তি উৎপাদন, নগর পরিকল্পনা এবং জননিরাপত্তা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত জানানোর ক্ষেত্রেও আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান সমস্যাঘটিত বৈশ্বিক পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আবহাওয়াবিদ্যা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাতের ধরণ পরিবর্তন এবং আরও ঘন ঘন চরম প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘটনাগুলি বিশ্বব্যাপী প্রাণীকুলের জন্য উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি তৈরি করছে। বিশ্ব আজ খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা, পানীয় জলের অভাব এবং বাসস্থান সংকটের সম্মুখীন। জলবায়ু সংক্রান্ত তথ্য একত্রিত করার মাধ্যমে আবহাওয়াবিদরা আমাদের জলবায়ু পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে এবং জলবায়ু-সম্পর্কিত বিপদগুলির প্রতি আরো সতর্ক হতে সাহায্য করতে পারেন।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের অগ্রগতিতেও আবহাওয়াবিদ্যার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। উন্নত আবহাওয়ার পূর্বাভাস মডেল তৈরি করা থেকে শুরু করে পরবর্তী প্রজন্মের স্যাটেলাইট সিস্টেম ডিজাইন করা— আবহাওয়াবিদরা অত্যাধুনিক গবেষণা এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নের অগ্রভাগে রয়েছেন। আবহাওয়া সংস্থা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিগত-খাতের অংশীদারদের মধ্যে সহযোগিতামূলক উদ্যোগ, পর্যবেক্ষণমূলক কৌশল, তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি এবং পূর্বাভাসমূলক মডেলিং-এর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটিয়েছে, পৃথিবীর জটিল জলবায়ু ব্যবস্থার নিরীক্ষণ ও তার ফলাফল বোঝার ক্ষমতাকে বাড়িয়েছে।

বিশ্ব আবহাওয়া দিবসের তাৎপর্যের উপলব্ধি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রতিফলিত হওয়ার সাথে সাথে আবহাওয়ার প্রস্তুতি এবং জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতার প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতিশীল হয়ে উঠতে হবে। আবহাওয়াবিদ্যার শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আমরা আবহাওয়া এবং জলবায়ু গতিশীলতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করতে পারি, চরম প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকিগুলি কম করতে পারি এবং আগামী প্রজন্মের জন্য আরও টেকসই এবং স্থিতিস্থাপক ভবিষ্যত গড়ে তুলতে পারি।

আমরা সবাই মিলে একটি আবহাওয়া-প্রস্তুত, জলবায়ু-স্মার্ট ভবিষ্যতের লক্ষে কাজ করি, যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি এবং সমাজের জ্ঞান, সম্পদ এবং পরিবর্তিত জলবায়ুতে উন্নতি করার জন্য স্থিতিস্থাপকতা হবে এই লড়াইয়ের হাতিয়ার। সহযোগিতা, উদ্ভাবন এবং সম্মিলিত পদক্ষেপের মাধ্যমে আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট দুর্যোগের মোকাবেলা করতে সচেষ্ট হই, বিশ্বকে বাসযোগ্য করে তুলি।

এই বিশ্ব আবহাওয়া দিবসে আসুন আমরা সমাজে আবহাওয়াবিদ্যার অমূল্য অবদান উপলব্ধি করি এবং আবহাওয়ার প্রস্তুতি, জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা এবং পরিবেশগত সচেতনতা প্রচারে নিজেদেরকে নিয়োজিত করি। সকল বাধার মোকাবেলা করে সবার জন্য গড়ে তুলি একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যত। ●

লেখক ***ডঃ নকুল পারাশর*** *শান্তি ফাউন্ডেশনের মূল কর্মাধ্যক্ষ্য।*
ইমেল: nakul.parashar@gmail.com

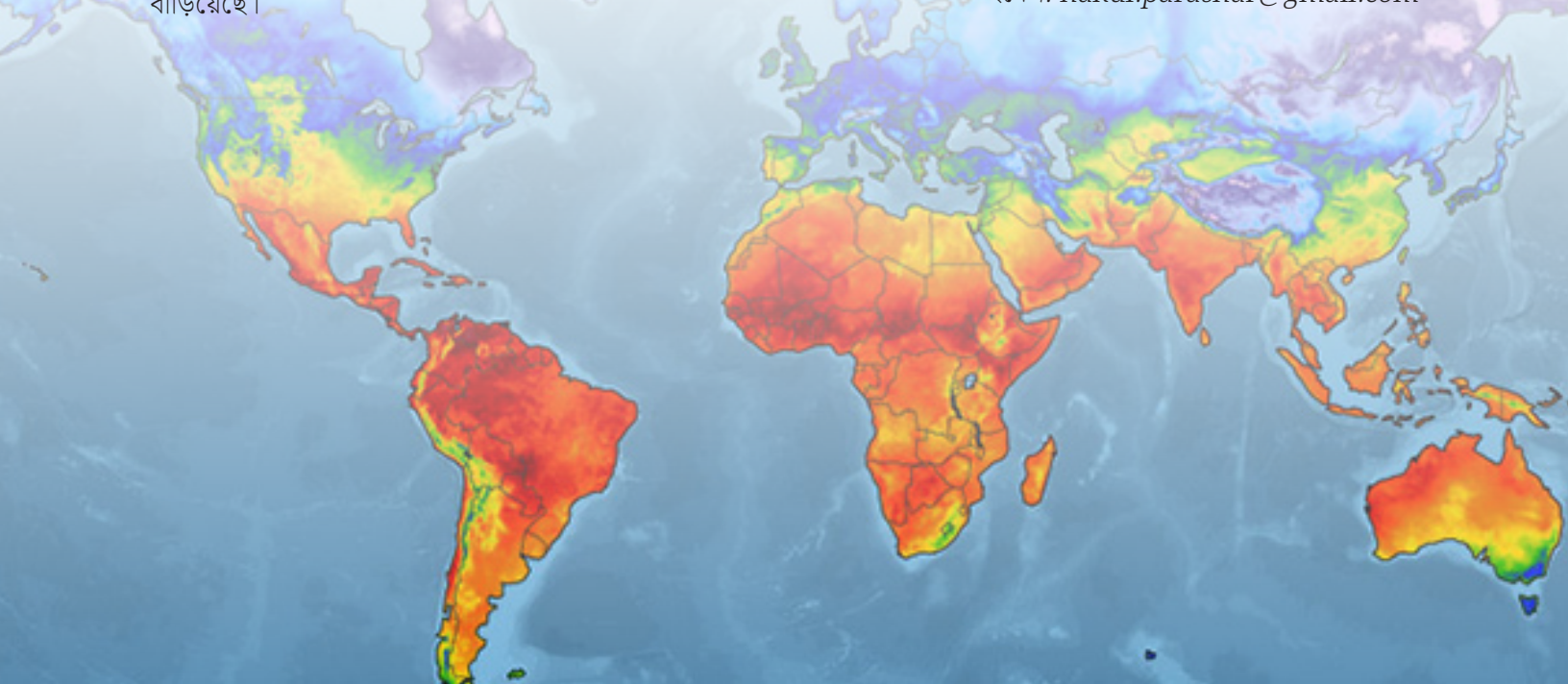

বসন্ত বৌরি

তাপস কুমার দত্ত

শহরের আকাশচুম্বী ফ্ল্যাট বাড়ীর এক চিলতে বারান্দাতে কাক, শালিক আর চড়াই ছাড়া আর অন্য পাখির পায়ের ধূলো পড়ে না সেখানে। বারান্দাতে দাঁড়িয়ে যতদূর চোখ যায় শুধু বড়ো বড়ো অট্টালিকা ছাড়া কিছুই যেন চোখে পড়ে না। তবে শহরের আকাশের উপরের দিকে তাকালে কোনো কোনো সময়ে শিকারী (চিল, বাজ) পাখির দেখা মিলতে পারে। তবে শহরের এই সমস্ত গাছপালা আমরা লক্ষ্য একটা ধারে কাছে নয়। করতে হলে বাড়ীর সাথে সাথে পাখি ত্যাগ করে ভিন্ন অট্টলিকা থেকে যে সমস্ত করতে পারি সেটা কিন্তু খুব এই বৃক্ষকে ভালো করে লক্ষ্য বাইরে বার হতে হবে। বৃক্ষের দেখতে হলে এই পরিবেশ পরিবেশে আসতে হবে। শহরের আনাচে কানাচে অনেক জায়গাতে পার্ক বা সবুজ বাগান আছে, যদি ঘন পাতাওয়ালা কোনো গাছ থাকে তবে একটু ভালো করে নজর দিলে সুন্দর একটা পাখির দেখা মিলতে পারে সেটা হলো ছোটো বসন্ত বৌরি।

ইংরাজীতে এর নাম হলো Coppersmith Barbet এবং এই পাখির বৈজ্ঞানিক নাম হলো *Megalaima haemacephala*। শহরের কোলাহল ও বিভিন্ন ধরনের আওয়াজ যখন একটু কম থাকে তখন এই পাখি ঠোঁট না খুলে গাছের পাতার আড়ালে থেকে সারাক্ষণ টুক–টুক–টুক–টুক শব্দে আওয়াজ করতে থাকে। কামারশালাতে হাতুড়ি পেটানোর শব্দ যেমন হয় এই পাখির ডাকও সেরকম হয়। সেইজন্যই পাখির নাম কপারস্মিথ বারবেট।

এই পাখি আকারে খুব একটা বড় হয় না। তবে পাখি দেখতে বড় সুন্দর হয়। পাখির মাথার উপরের দিকের অংশ গাঢ় লাল রঙের হয়ে থাকে। চোখ গোল আকারের এবং চোখের চারদিকে লাল রঙের রিং থাকে। লাল রঙের রিঙের উপরের ও নীচের দিকে হলুদ রঙর দাগ থাকে। গলার দিকে ঠোঁটের নীচে হালকা হলুদ রঙের হয়। সেইজন্য অনেকে এই পাখিকে ক্রিমসন ব্রেস্টেড বারবেট বলে। হলুদ রঙের নীচেই লাল রঙের ছটা থাকে আবার তার ঠিক নীচে হালকা হলুদ রঙের ছটা থাকে। বুকের রঙ হালকা কালচে সবুজের সাথে সাদা রঙের প্যাচিং থাকে। পিঠের দিকের অংশ সবুজ থাকে তার সাথে সাদা রঙের প্যাচিং থাকে। ঠোঁট বেশ বড় আকরের হয় এবং ঠোঁটের উপর গোঁপ থাকে। ঠোঁট যেখানে শেষ হয় সেখানে হলুদ রঙের তলা থেকে কালো রঙের অংশ দেখা যায়। বড় সুন্দর এই পাখি শহরের বুকে আমরা আজও দেখতে পাই।

খুব ভালো করে যদি আমরা লক্ষ্য করি তবে দেখতে পাবো এরা যখন মুখে আওয়াজ করে তখন কেবলই মাথাটা নড়ছে। এটা যেন মনে হবে ভেন্ট্রিলোকুজম এফেক্টের মতন। এরা সাধারনতঃ বৃক্ষের উপর পাতার আড়ালে থাকতেই ভালোবাসে। এদেরকে কখনই মাটিতে নামতে দেখা যায় না।

খাদ্য হিসাবে এরা বট, অশ্বত্থ, পিপুল, পাকা

পেঁপে ইত্যাদি ফল খেয়ে থাকে। ফল ছাড়া এরা প্রোটিন খাদ্য হিসাবে মথ, অনেক ধরনের কীটপতঙ্গ ভক্ষন করে। শালিক, বুলবুল,ছাতারে, গ্রিন পিজিয়ন ইত্যাদি পাখির সাথে এক সাথে এদেরকে সহাবস্থান করতে দেখা যায়।

পুরানো মরা নরম কাঠের গাছের কোটরে বা অন্য পাখিদের গর্ত করা বাসাতে এরা ডিম পাড়ে। নতুন করে এরা কোনো বাসা বাধেঁ না। জানুয়ারী থেকে জুন মাসে এদেরকে বাসা বাঁধতে দেখা যায় এবং এই সময়ে এরা প্রজনন করে। বাসাতে এরা সাদা রঙের তিনটি ডিম পাড়ে, ডিম ফুটে বাচ্ছা হওয়ার পর এদের স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে মিলে বাচ্ছার লালন পালন করে। এরা বাচ্ছাদের যথাসময়ে প্রোটিন খাদ্য হাসাবে পোকামাকড়, আবার গাছের পাকা ফল সংগ্রহ করেও বাচ্ছাদের খাওয়ায়।

এছাড়া বাসার মধ্যে যে নোংরা আবর্জনা হয়ে থাকে সেগুলি এরা ঠোঁটের মাধ্যমে সংগ্রহ করে বাসার বাইরে ফেলে দেয় অর্থাৎ এরা বাসাকে সব সময়ের জন্য পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করে। বছরের যে কোনো ঋতুতে এদেরকে দেখা যায়, তবে বসন্তকালে এদের ডাক যেন বেশী শোনা যায়। এদের ঠাক শুনলে মনে হয় বসন্তকাল ও গ্রীষ্মের দুপুরটার নিঃঝুমাতা অনেকটাই কেটে যায়।

এই পাখি সারা ভারতেই পাওয়া যায় অর্থাৎ ভারতীয় উপমহাদেশ এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে এদের আনাগোনা আছে। এখনও এদেরকে আমরা আমাদের আশেপাশে ভালো সংখ্যাতেই দেখতে পাই, সেইকারনেই আই ইউ সি এন বা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার এর লাল তালিকাতে বা রেড ডেটা লিস্টে বসন্তবৌরি এখনও অন্তর্ভূক্ত হয়নি ।

এই বসন্তবৌরির ছাড়া আর এক ধরনের বসন্তবৌরি আমরা শহর ও গ্রামে দেখতে পাই যাকে আমরা নীলকান্ত বসন্তবৌরি বলি। যার ইংরাজীতে নাম হলো Blue Throat Barbet। আকারে এরা Coppersmith Barbet এর থেকে সামান্য কিছু বড় হয়। যার বৈজ্ঞানিক নাম হলো *Megalaima asiatica*। এদের গলার অংশ নীল রঙের হয় এবং নীল রঙ যেখানে শেষ হয় তার দুপাশে লাল রঙের দাগ থাকে। মাথার অংশের রঙ লাল রঙের হয়ে থাকে এবং বাকী অংশের রঙ সবুজ হয়। চোখের উপর মাথার উপর কালো রঙের একটা দাগ থাকে। এরাও খাদ্য হিসাবে এরা বট, অশ্বথ্থ, পিপুল, পাকা পেঁপে ইত্যাদি ফল খেয়ে থাকে। ফল ছাড়া এরা প্রোটিন খাদ্য হিসাবে মথ, অনেক ধরনের কীটপতঙ্গ ভক্ষন করে। এরা মার্চ মাস থেকে জুন মাসের মধ্যে বাসা বাঁধে এবং বাসাতে তিন থেকে চারটি ডিম পাড়ে। বাকী সব বৈশিষ্ট্য মোটামুটি Coppersmith Barbet এর মতই হয়ে থাকে।

এখনও এদের শহর ও গ্রামের উভয় জায়গাতেই দেখা মেলে। এরকম ভাবেই যেন আমাদের পরিবেশে এরা চিরদিন বেঁচে থাকে। ●

*লেখক **শ্রী তাপস কুমার দত্ত** বিজ্ঞান লেখক এবং লোকবিজ্ঞান প্রচারক। ইমেল: tapashkumardutta.2012@gmail.com*

সহজ পথে পিথাগোরীয় ত্রয়ীর হদিশ

(প্রথম পর্ব)

ভূপতি চক্রবর্তী

সমকোণী ত্রিভুজের যে ধর্মটি আমাদের সবচেয়ে বেশি পরিচিত তা হচ্ছে যে তার দুটি ক্ষুদ্রতর বাহুর বর্গের সমষ্ঠি তার বৃহত্তম পার্শ্ব, অর্থাৎ অতিভুজের বর্গের সমান। সমকোণী ত্রিভুজের এই ধর্মটির ব্যাপারে তার সময়ের বহু আগে থেকেই মানুষের কাছে পরিচিত থাকলেও গ্রীক গণিতজ্ঞ পিথাগোরাস প্রথম জ্যামিতির সাহায্যে এই বিশেষত্বের প্রমাণ উপস্থাপনা করেন। তাই এই সম্পর্কটি পিথাগোরাসের সম্পর্ক নামে পরিচিত। তবে বহু আগেই একটা প্রশ্ন সম্ভবত কিছুটা কৌতুহলবশেই উঠে এসেছিল। আমরা এই যে একটি সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে দুটি বাহু আর অতিভুজের কথা বলছি এদের সকলকেই কি পূর্ণ বা অখন্ড সংখ্যা দিয়ে সূচিত করা সম্ভব? এক কথায় এর উত্তর হচ্ছে; হ্যাঁ সম্ভব। অখণ্ড সংখ্যা দিয়ে গঠিত ত্রয়ীর কথা বললে আমাদের (3, 4, 5), (5, 12, 13) কিংবা (7, 24, 25) প্রভৃতির কথা মনে পড়ে। যেহেতু এরা পিথাগোরীয় সম্পর্ককে মেনে চলছে (কারণ $3^2 + 4^2 = 5^2$; $5^2 + 12^2 = 13^2$ প্রভৃতি) বা সিদ্ধ করছে তাই এই ত্রয়ীদের বলা হয় পিথাগোরীয় ত্রয়ী। অপেক্ষাকৃত তিনটি ছোট সংখ্যা দিয়ে গঠিত কিছু পিথাগোরীয় ত্রয়ীকে হয়ত আমরা আমাদের স্মৃতিতে ধরে রাখতে পারি কিন্তু একটু চিন্তা করলেই টের পাওয়া যায় এই ত্রয়ীদের তো শেষ নেই। কারণ আর কিছু না হোক কেবল একটি ত্রয়ীর সবক'টি সদস্যকে কোন অখন্ড সংখ্যা দিয়ে গুণ করলেই তো পাওয়া যাবে আর এক নতুন ত্রয়ী যার সদস্যেরা সকলেই অখন্ড সংখ্যা। এভাবে তাই কত ত্রয়ী যে পাওয়া যাবে তার ইয়ত্তা নেই। সত্যিই তারা সংখ্যায় অসীম। আর তাছাড়া অন্য ভাবে এবং অন্য পথেও হয়ত বা মিলতে পারে এই ধরণের ত্রয়ীর হদিশ। কিন্তু তাদের পাব কীভাবে? কিংবা আমরা আজ যাদের চিনি এবং হয়ত বা সহজেই মনে রাখি তাদেরই প্রথম গণনা হয়েছিল কীভাবে?

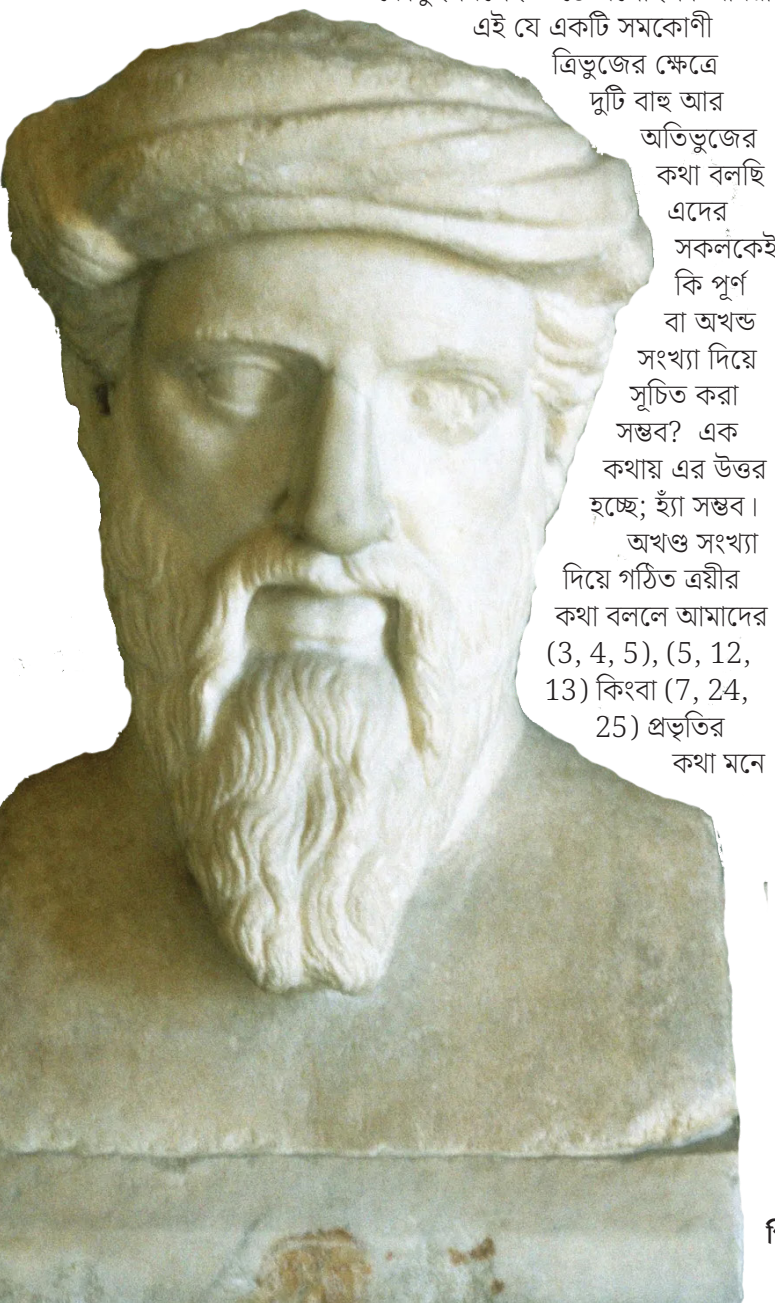

পিথাগোরাস

এই ব্যাপারে গোড়াতে কিছু সূত্র পাওয়া গিয়েছিল প্রাচীন গ্রীক গণিতবিদদের থেকে। সেগুলি খুবই কার্যকরী। সেই সূত্রগুলিতে গোড়াতে আমরা যাবো না যদিও ঐতিহাসিকভাবে তাদেরই প্রথম পাওয়া গিয়েছিল। তবে সেই সূত্রগুলিতে পৌঁছে যাওয়ার কিছু সহজ সরল পথও আমরা পরবর্তীকালে পেয়েছি। এখানে আমরা সেইরকম কয়েকটি সহজ পথের বিষয়ে আলোচনা করবো, দেখতে পাবো কীভাবে কিছু চট্‌জলদি রাস্তায় হদিশ পাওয়া যাওয়া যায় ত্রয়ীদের। আর এর জন্য যে গাণিতিক জ্ঞান বা দক্ষতা লাগবে তা স্কুলের মাঝের শ্রেণিতে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের বেশ ভালোভাবেই জানা আছে। তারপর না হয় দেখা যাবে, সেগুলির সঙ্গে প্রাচীন সূত্রগুলির যোগ ঠিক কী রকমের। এই সহজ পথের সুবিধা হচ্ছে যে, গণিত যদি আপনার খুব কাছের বিষয় নাও হয়; এই পথে পিথাগোরীয় ত্রয়ী আপনি খুব সহজে বার করতে পারবেন। তবে হ্যাঁ একটা ক্যালকুলেটারের সাহায্য কিন্তু লাগবে। এই বিভিন্ন পথগুলিকে আমরা এবার এক, দুই, তিন ... এইভাবে চিহ্নিত করে এগোবো। তারপর আমাদের চেষ্টা থাকবে এই সহজ সরল পথগুলির সঙ্গে গ্রীক গণিতবিদদের দেওয়া ফর্মুলাগুলির কোথায় যোগসূত্র রয়েছে সেগুলো খুঁজে দেখার।

প্রথম পদ্ধতি—দুটি ধনাত্মক সংখ্যার গুণফল যখন দুই [2] হয়

এই পদ্ধতিতে গোড়াতে আমাদের চাই দুটি ধনাত্মক সংখ্যা, যাদের গুণফল হবে 2। তা কীভাবে সেই দুটি সংখ্যা নির্বাচন করা যায়? একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে একমাত্র 2 আর

1 কে নির্বাচন করলে দুটিই অখন্ড সংখ্যা হতে পারে, যাদের গুণফল 2। তবে 2 ছাড়া যে কোন একটি পূর্ণ বা অখন্ড সংখ্যা নিয়ে আর একটি প্রকৃত ভগ্নাংশ নির্বাচন করে সে দুটির গুণফল 2 পাওয়া সম্ভব। যেমন, যদি একটি অখন্ড সংখ্যা 11 নিয়ে তাকে একটি প্রকৃত ভগ্নাংশ 2/11 দিয়ে গুণ করি তাহলেও 2 পাওয়া যাবে। আর তাছাড়া একটি প্রকৃত ভগ্নাংশ আর অপরটি মিশ্র ভগ্নাংশ হতে পারে। দুটিই মিশ্র ভগ্নাংশ নিয়েও এই কাজ করা যায় সেক্ষেত্রে একটি মিশ্র ভগ্নাংশ হবে 2 এর থেকে সামান্য কম আর অপরটি হবে 1 এর থেকে সামান্য বেশি। নিচে বিষয়টি বিস্তৃতভাবে দেখানো হল। আবারও বলা যাক যে, মনে রাখতে হবে যে শর্ত কেবল একটাই তাদের গুণফল হতে হবে 2। এইরকম সংখ্যাগুচ্ছ তাহলে কীরকম হতে পারে দেখা যাক।

(1) $(3, \frac{2}{3})$; [একটি পূর্ণ সংখ্যা (3), একটি ভগ্নাংশ $(\frac{2}{3})$ অর্থাৎ প্রকৃত ভগ্নাংশ] বা $(6, \frac{1}{3})$ যেহেতু পূর্ণ সংখ্যাটি যুগ্ম বা অযুগ্ম দুইই হতে পারে আমাদের দুটি ক্ষেত্র আলাদা করে দেখতে হবে।

(2) $(\frac{3}{4}, \frac{8}{3})$ [একটি প্রকৃত ভগ্নাংশ $(\frac{3}{4})$ ও অপরটি মিশ্র ভগ্নাংশ] বা $(\frac{4}{17}, \frac{17}{2})$ প্রকৃত ভগ্নাংশ হবে 1 এর থেকে ছোট এবং তাদের হর ও লবের মধ্যে কোন সাধারণ উৎপাদক থাকবে না।

(3) $(\frac{12}{11}, \frac{11}{6})$ [উভয়েই মিশ্র ভগ্নাংশ] কিংবা $(\frac{7}{5}, \frac{10}{7})$ এখানে উভয়েই 1 এর থেকে বড় কিন্তু একটি সামান্য বড় আর একটি 2 এর থেকে থেকে সামান্য ছোট। এইরকম উদাহরণ আরও রয়েছে, যেমন, $\frac{9}{8}$ এবং $\frac{16}{9}$

(4) (2 এবং 1) [উভয়েই অখন্ড সংখ্যা]। এইরকম উদাহরণ আর সম্ভব নয়।

এই পথের মত আকর্ষণীয় পথ সম্ভবত আর নেই। কারণ আমরা ওপরে যেমন চার রকমের বিকল্পের কথা বলেছি। কেবল তাই নয় একটি পদ্ধতির আবার একাধিক শাখা রয়েছে। এখানে দেখা যাবে বলেছি তার এক একটি পথ বেছে নিলে আমরা পৌঁছে যাব এক একটি ধরনের ত্রয়ীর কাছে। কিন্তু আমাদের করতে হবে কী? সেই কথা বরং আগে বলে নেওয়া যাক।

ক) যে দুটি সংখ্যা নির্বাচন করেছি, অর্থাৎ যাদের গুণফল 2 তাদের প্রতিটির সঙ্গে 2 যোগ করতে হবে।

খ) এইভাবে যে নতুন দুটি সংখ্যা পাওয়া গেল তাদের মধ্যে বজ্রগুণন পদ্ধতিতে একটির হর অপরটির লবের সঙ্গে গুণ করতে হবে। এদের মধ্যে যদি কোন অখন্ড সংখ্যা থাকে তাহলে তার লব 1 এর সমান ধরে নিতে হবে। ধরা যাক প্রাপ্ত সংখ্যা দুটি যদি হয় $\frac{13}{5}$ এবং $\frac{16}{3}$ ব্যাপারটা হবে রকম এই রকম; $\frac{13}{5} \times \frac{16}{3}$ এবং সেখান থেকে এইভাবে আমরা পাবো 39 এবং 80

গ) আর এইভাবে যে দুটি সংখ্যা পাওয়া যাবে তারা সমকোণী ত্রিভুজের দুটি বাহু গঠন করবে।

ঘ) তাদের বর্গের যোগফল নিয়ে তার বর্গমূল করলে পাওয়া যাবে অতিভুজ এবং তা হবে আর একটি অখন্ড সংখ্যা

এবার আমরা **(ক)** পদ্ধতির ওপরে এই সূত্রের প্রয়োগ দেখে নেবো পূর্ণ সংখ্যাটিকে অযুগ্ম নিয়ে।

একটি পূর্ণ সংখ্যা ও একটি ভগ্নাংশের গুণফল যখন 2 হচ্ছে তখন এই পূর্ণ সংখ্যা যুগ্ম বা অযুগ্ম উভয়ই হতে পারে। ভগ্নাংশ নির্বাচিত হবে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। দুটি ক্ষেত্রেই আমাদের আলাদা করে দেখতে হবে পিথাগোরীয় ত্রয়ীর চরিত্র একইরকম থাকছে না কি সেখানেও কিছু পরিবর্তনের ছাপ আসছে।

প্রথমে উদাহরণ হিসেবে আমরা নিলাম একটি অযুগ্ম পূর্ণ সংখ্যা 5 আর উপযুক্ত ভগ্নাংশ $\frac{2}{5}$ কে, কারণ $5 \times \frac{2}{5} = 2$। সদস্য জোড়ার বাছাইপর্ব শেষ; এবার আমাদের যাত্রা শুরু। এবার উভয়ের সঙ্গে 2 যোগ করা যাক। আমরা পাবো

$$5 + 2 = 7 \quad \text{আর} \quad \frac{2}{5} + 2 = \frac{12}{5}$$

বজ্রগুণনের পরে $\frac{7}{1} \times \frac{12}{5}$ আমরা সমকোণী ত্রিভুজের দুটি বাহু হিসেবে পাবো 12 এবং 35

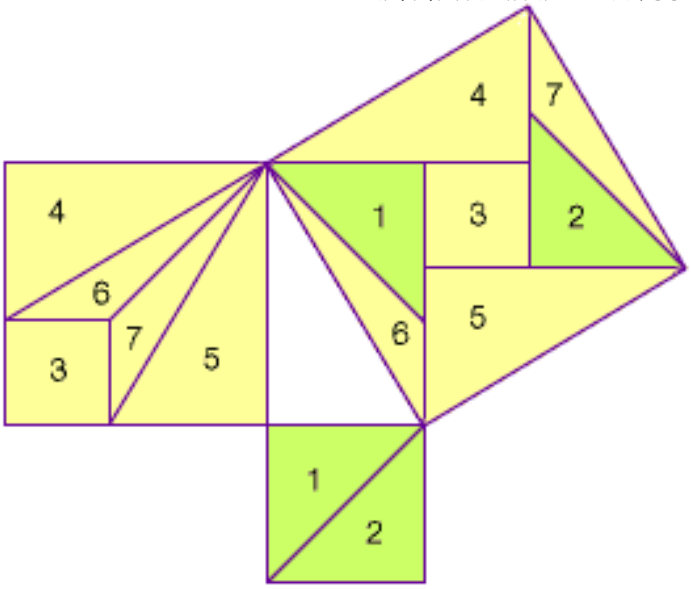

তাহলে অতিভুজ হবে $\sqrt{12^2 + 35^2} = \sqrt{144 + 1225} = \sqrt{1369} = 37$

সুতরাং ত্রয়ীটি হবে (12, 35, 37)। এটি প্রকৃতপক্ষে একটি মৌলিক ত্রয়ী। কীভাবে তা টের পাওয়া গেল? সেই আলোচনায় আসার আগে একবার দেখে নেওয়া যাক আর একটি ভিন্ন অযুগ্ম সংখ্যা নির্বাচন করে এগিয়ে গেলে কী পাওয়া যাচ্ছে।

এই ধরণের আর একটি অর্থৎ অযুগ্ম সংখ্যা ও উপযুক্ত ভগ্নাংশ নির্বাচন করে দেখা যাক কী পাওয়া যাচ্ছে।

ধরা যাক পূর্ণ সংখ্যা নেওয়া হল 11 আর তাহলে ভগ্নাংশ নিতে হবে $\frac{2}{11}$

$$11 + 2 = 13 \quad \text{আর} \quad \frac{2}{11} + 2 = \frac{24}{11}$$

বজ্রগুণনের পরে দুটি বাহু পাওয়া যাবে এবং তারা হবে 24 এবং 143

তাহলে অতিভুজ হবে $\sqrt{24^2 + 143^2} = \sqrt{576 + 20449} = \sqrt{21025} = 145$ এবং ত্রয়ীটি হবে (24, 143, 145)।

আসলে মৌলিক ত্রয়ী হওয়ার জন্য শর্ত অবশ্যই এই যে, সংখ্যাগুলির মধ্যে কোন সাধারণ উৎপাদক থাকবে না। তবে বড় বড় সংখ্যা হলে সাধারণ উৎপাদক খুঁজে পাওয়া কিছুটা শক্ত হয়ে ওঠে। তাই সেজন্য রয়েছে একটি তুলনায় বিস্তৃত পদ্ধতি। এখনই তার মধ্যে না ঢুকেও তিনটি সংখ্যার মধ্যেকার কিছু বৈশিষ্ট্য চট করে দেখে নিয়ে অনেকটাই বোঝা যায় যে এটি মৌলিক ত্রয়ী কিনা। এই পদ্ধতি গাণিতিকভাবে অবশ্যই

একেবারে সম্পূর্ণ পাকাপোক্ত নয় তবে এই রাস্তায় খানিকটা আঁচ করা যায় ত্রয়ীর চরিত্র। তাই মৌলিক ত্রয়ীর ক্ষেত্রে যে দিকগুলোর দিকে নজর দেওয়া যায়, সেগুলি হচ্ছে

ক) বাহুদুটির একটি যুগ্ম ও অপরটি অযুগ্ম

খ) অতিভুজ অযুগ্ম সংখ্যা

গ) তিনটি পার্শ্বের মধ্যে কোন সাধারণ উৎপাদক নেই

আর এই কারণেই প্রথম দুটি শর্ত পূরণ হওয়ার পরে যদি দেখা যায় যে, অতিভুজ ও বৃহত্তর বাহুর পার্থক্য এক (1) বা দুই (2) হয় তাহলে সেই ত্রয়ী হবে মৌলিক ত্রয়ী। কারণ তাহলে পার্শ্বগুলির মধ্যে সাধারণ উৎপাদক পাওয়া যাবে না। আর তাই এক্ষেত্রে যেহেতু বৃহত্তর বাহু ও অতিভুজের পার্থক্য 2 তাই সাধারণ উৎপাদক খুঁজতে চেষ্টা না করে নিরাপদে বলা যায় যে এই ত্রয়ী অবশ্যই মৌলিক ত্রয়ী।

আমরা একটু দেখি গাণিতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই ধরণের মৌলিক ত্রয়ীর জন্য কোন একটি সাধারণ সূত্রের হদিশ মেলে কিনা।

যেহেতু এখানে প্রথম সংখ্যা হিসেবে একটি অযুগ্ম অখন্ড সংখ্যাকে নেওয়া হচ্ছে আমরা লিখতে পারি যে এই সংখ্যাটি হল $(2p + 1)$, যেখানে একটি অখন্ড ধনাত্মক অযুগ্ম পূর্ণ সংখ্যা। তাহলে অপর সংখ্যাটি হবে $\frac{2}{2p+1}$

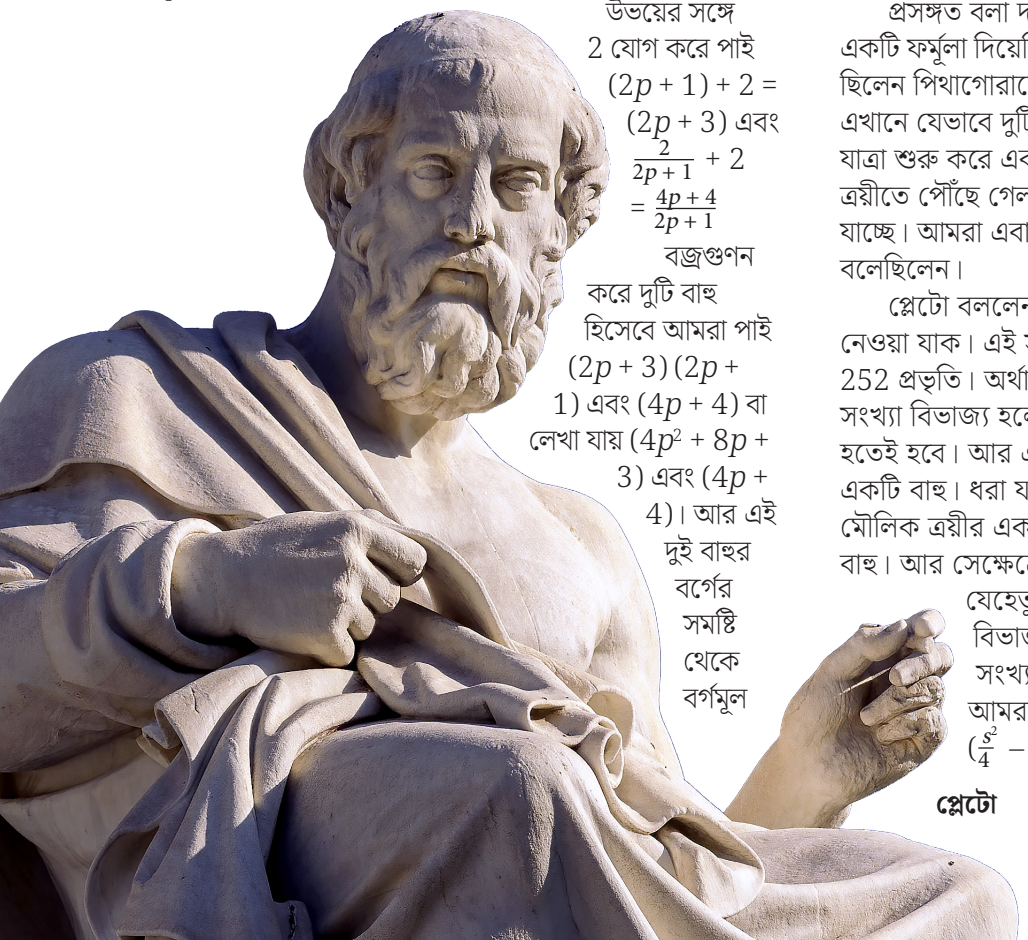

উভয়ের সঙ্গে 2 যোগ করে পাই $(2p + 1) + 2 = (2p + 3)$ এবং $\frac{2}{2p+1} + 2 = \frac{4p+4}{2p+1}$

বজ্রগুণন করে দুটি বাহু হিসেবে আমরা পাই $(2p + 3)$ $(2p + 1)$ এবং $(4p + 4)$ বা লেখা যায় $(4p^2 + 8p + 3)$ এবং $(4p + 4)$। আর এই দুই বাহুর বর্গের সমষ্টি থেকে বর্গমূল নিয়ে পাওয়া যাচ্ছে অতিভুজ $(4p^2 + 8p + 5)$। সুতরাং ত্রয়ীটি হচ্ছে $[(4p^2 + 8p + 3), (4p + 4), (4p^2 + 8p + 5)]$

এটি একটি মৌলিক ত্রয়ী। কারণ, এখানে দেখা যাচ্ছে যে বাহু দুটির একটি যুগ্ম ও অপরটি অযুগ্ম। আর অতিভুজ একটি অযুগ্ম সংখ্যা। তার ওপর তাদের মধ্যে কোন সাধারণ উৎপাদক নেই। এখানে সেই ব্যাপারটা বেশ সহজেই বলা যাচ্ছে তার কারণ অতিভুজ এবং অযুগ্ম বাহুর পার্থক্য 2। দুটি অযুগ্ম সংখ্যার পার্থক্য 2 হলে অর্থাৎ তারা পরপর দুটি অযুগ্ম সংখ্যা হলে তাদের মধ্যে কোন সাধারণ উৎপাদক থাকার সুযোগ নেই। যেমন, $(4p^2 + 8p + 5) - (4p^2 + 8p + 3) = 2$

দুটি অযুগ্ম সংখ্যার পার্থক্য 2 হলে অর্থাৎ তারা পরপর দুটি অযুগ্ম সংখ্যা হলে তাদের মধ্যে কোন সাধারণ উৎপাদক থাকার সুযোগ নেই।

লক্ষ করার বিষয় যে, p এর মান যাই হোক না কেন এইভাবে পাওয়া সব মৌলিক ত্রয়ীর ক্ষেত্রেই অতিভুজ ও বৃহত্তর বাহুর পার্থক্য সব সময়ই হবে 2 এবং তা p এর মান এর ওপরে নির্ভর করে না। p-এর মান যাই হোক না কেন। এই জন্যই বলা যায় যে, এই পথে সর্বদা উঠে আসবে মৌলিক পিথাগোরীয় ত্রয়ী ঠিকই, তবে তারা হবে কিছুটা একঘেয়ে। তাই রাস্তাটা বেশ সরল হলেও তার আকর্ষণ কিছুটা কম। এটা যেন একই রঙের আর একই ডিজাইনের জামা পাওয়া যাচ্ছে, কেবল তাদের সাইজে রয়েছে তফাৎ।

প্রসঙ্গত বলা দরকার, গ্রীক দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ প্লেটো একটি ফর্মুলা দিয়েছিলেন পিথাগোরীয় ত্রয়ী গঠনের জন্য। প্লেটো ছিলেন পিথাগোরাসের কিছুটা পরবর্তী সময়ের মানুষ। আমরা এখানে যেভাবে দুটি পরপর অযুগ্ম সংখ্যার একক ভগ্নাংশ নিয়ে যাত্রা শুরু করে একটা বিশেষ শ্রেণির মৌলিক পিথাগোরীয় ত্রয়ীতে পৌঁছে গেলাম প্লেটোর দেওয়া পথে সেখানেই পৌঁছনো যাচ্ছে। আমরা এবার দেখে নেব প্লেটো তার ফর্মুলায় ঠিক কী বলেছিলেন।

প্লেটো বললেন যে একটা চার (4) দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা নেওয়া যাক। এই সংখ্যা হতে পারে 12, 28, 100 কিংবা 252 প্রভৃতি। অর্থাৎ অন্য কোন সংখ্যা দিয়ে এই গৃহিত সংখ্যা বিভাজ্য হলে আপত্তি নেই, তবে তাকে 4 দ্বারা বিভাজ্য হতেই হবে। আর এই সংখ্যাটি হবে পিথাগোরীয় ত্রিভুজের একটি বাহু। ধরা যাক 4 দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাটি s, তাহলে মৌলিক ত্রয়ীর একটি বাহু হবে s, আর এটি হবে জোড় বা যুগ্ম বাহু। আর সেক্ষেত্রে বিজোড় বা বিযুগ্ম বাহু হবে $(\frac{s^2}{4} - 1)$।

যেহেতু s, 4 দ্বারা বিভাজ্য তাই s^2 হবে 16 দিয়ে বিভাজ্য। আর অর্থ হচ্ছে $\frac{s^2}{4}$ একটি যুগ্ম পূর্ণ সংখ্যা। সেখান থেকে 1 বা এক বিয়োগ করলে আমরা পাবো একটি অযুগ্ম সংখ্যা। তাই $(\frac{s^2}{4} - 1)$ ঐ সমকোণী ত্রিভুজের অযুগ্ম বাহু।

প্লেটো

আর ত্রিভুজের অতিভুজ হবে $(\frac{s^2}{4} + 1)$, কারণ

$$\sqrt{(s)^2 + (\frac{s^2}{4} - 1)^2} = \sqrt{(\frac{s^2}{4} + 1)^2} = (\frac{s^2}{4} + 1)$$

এর ফলে পিথাগোরীয় ত্রয়ীটি হল,

$$s, (\frac{s^2}{4} - 1), (\frac{s^2}{4} + 1)$$

সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে এখানে অতিভুজ ও বিজোড় বাহুর পার্থক্য হবে 2 এর সমান, কারণ

$$(\frac{s^2}{4} + 1) - (\frac{s^2}{4} - 1) = 2$$

এই ফর্মুলার সাহায্যে মৌলিক পিথাগোরীয় ত্রয়ী পাওয়া যায় ঠিকই তবে সেখানে দেখা যায় অতিভুজ ও বিযুগ্ম বাহুর মধ্যে সর্বদা পার্থক্য হচ্ছে 2 এর সমান। তাই বলা যায় যে আমরা প্রথম পথে অযুগ্ম সংখ্যা নিয়ে যাত্রা শুরু করে আদতে পৌঁছে গেছি প্লেটোর দেওয়া সূত্রে।

দুটি অখন্ড সংখ্যা এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যে যে তাদের বর্গের যোগফল একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হয়। আর তা হলেই এভাবে প্রাপ্ত সংখ্যাটির বর্গমূল নিয়ে অতিভুজ পাওয়া যাবে এবং তা হবে এক অখন্ড সংখ্যা।

খুব স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠবে যে আমরা এই পথে চলতে গিয়ে পূর্ণ সংখ্যাটিকে যদি যুগ্ম সংখ্যা নিতাম তাহলে ঠিক কী পাওয়া যেত। একটি অযুগ্ম সংখ্যার সঙ্গে উপযুক্ত ভগ্নাংশ দিয়ে গুণ করে 2 পাওয়া গেলে সেখান থেকে যাত্রা শুরু করে মৌলিক ত্রয়ীতে পৌঁছে যাওয়া যায়। আবার সঙ্গে সঙ্গে এটাও দেখা গেছে যে ওই শ্রেণির মৌলিক ত্রয়ী যেখানে অতিভুজ ও অযুগ্ম বাহুর পার্থক্য হচ্ছে সর্বদা 2। আর এই ধরণের মৌলিক ত্রয়ীদের পাওয়া যায় আমরা যদি প্রাচীন গ্রীক গণিতবিদ প্লেটোর দেওয়া সূত্র ব্যবহার করে মৌলিক ত্রয়ী পাওয়া চেষ্টা করি। তবে খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে যে অতিভুজ আর অযুগ্ম বাহুর পার্থক্য 2 হবে এমন মৌলিক ত্রয়ী আরও এক রাস্তায় বার করা যায় এবং সেই রাস্তাও নিঃসন্দেহে খুবই সরল। এখানে বিষয়টি একবার দেখে নেবো।

একক ভগ্নাংশ কাকে বলে আমরা সকলেই জানি। এটি এমন একটি ভগ্নাংশ যার লব হবে 1 আর হর হবে একটি অখন্ড সংখ্যা। অর্থাৎ $\frac{1}{22}$ বা $\frac{1}{17}$ এগুলি একক ভগ্নাংশের নমুনা। আমরা একে একটি অখন্ড সংখ্যার অনন্যকও বলতে পারি। আমাদের প্রথম পদ্ধতিতে আমরা শুরু করব পরপর থাকা দুটি বিজোড় বা বিযুগ্ম সংখ্যার একক ভগ্নাংশ নিয়ে বা দুটি ক্রমিক বিজোড় সংখ্যার একক ভগ্নাংশ নিয়ে। তারপর এগোবো তাদের যোগ করে।

যেমন ধরা যাক, আমরা নিলাম $\frac{1}{7}$ আর $\frac{1}{9}$। দেখা যাচ্ছে যে, 7 এবং 9 পরপর দুটি বিজোড় সংখ্যা তাই তাদের একক ভগ্নাংশ নিয়ে শুরু করা যাবে। এই দুটিকে আমরা যোগ করবো এবং তাদের যোগফল হবে $\frac{1}{7} + \frac{1}{9} = \frac{16}{63}$

ব্যাস্ আমাদের কাজ শেষ। যোগ করার পরে যে ভগ্নাংশ মিলেছে তার হর অর্থাৎ 63 এবং লব অর্থাৎ 16 একটি সমকোণী ত্রিভুজের দুটি বাহু সূচিত করছে।

লক্ষ করার বিষয়, দুটি পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে একটি সমকোণী ত্রিভুজের দুটি বাহু প্রায় সর্বদা পাওয়া যাবে। তাই যে কোন দুটি অখন্ড সংখ্যা দিয়ে একটি সমকোণী ত্রিভুজের দুটি বাহু তৈরি করা সম্ভব। প্রশ্ন হচ্ছে যে সেই ত্রিভুজের অতিভুজ কি অখন্ড সংখ্যা হবে? না, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা হবে না। যেমন আমরা 7 আর 18 কে একটি সমকোণী ত্রিভুজের দুটি বাহু ধরে নিয়ে এগোনোর চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু তাহলে অতিভুজ হবে $\sqrt{7^2 + 18^2} = \sqrt{49 + 324} = \sqrt{373}$

এই $\sqrt{373}$ কিন্তু আমাদের কোন অখন্ড সংখ্যা দেবে না, যদিও এই সমকোণী ত্রিভুজটি গঠন করা সম্ভব।। তাই একটি সমকোণী ত্রিভুজের দুটি অখন্ড বাহু সহজেই নির্বাচন করা গেলেও অতিভুজ অখন্ড সংখ্যা হিসেবে প্রায়শই পাওয়া যাবে না।

তাই দুটি অখন্ড সংখ্যা এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যে যে তাদের বর্গের যোগফল একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হয়। আর তা হলেই এভাবে প্রাপ্ত সংখ্যাটির বর্গমূল নিয়ে অতিভুজ পাওয়া যাবে এবং তা হবে এক অখন্ড সংখ্যা। ঠিক এরকমই একটি ঘটনা আমাদের একেবারে হাতে তুলে দিচ্ছে এই পদ্ধতিটি। কারণ, এইভাবে যে দুটি বাহু আমরা পেলাম অর্থাৎ, 63 এবং 16 তাদের আচরণ কিন্তু চমৎকার। যেমন,

$$\sqrt{16^2 + 63^2} = \sqrt{256 + 3969} = \sqrt{4225} = 65$$

এর অর্থ হচ্ছে যে (16, 63, 65) একটি পিথাগোরীয় ত্রয়ী। আর এটি একটি মৌলিক ত্রয়ী। কিভাবে বোঝা গেল? কারণ এর তিন সদস্যের মধ্যে কোন সাধারণ উৎপাদক নেই। এটাই বড় কথা, এটাই বিচারের মাপকাঠি। তবে এবং দুটি বাহুর একটি যুগ্ম ও অপরটি অযুগ্ম এবং অতিভুজ একটি অযুগ্ম রাশি হলে সেই ত্রয়ীর মৌলিক ত্রয়ী হয়ে ওঠার প্রাথমিক শর্ত পূরণ হয়। ●

লেখক ***ডঃ ভূপতি চক্রবর্তী*** *কলকাতার সিটি কলেজের পদার্থবিদ্যার প্রাক্তন অধ্যাপক ও বিজ্ঞান লেখক।*
ইমেল: chakrabhu@gmail.com

জাতীয় বিজ্ঞান দিবসে আরো কিছু অনুষ্ঠানের ঝলক

দেশের প্রগতি ও উন্নয়নে দেশীয় প্রযুক্তিতে জোর

দেশের অর্থনৈতিক ভিত আরও মজবুত হতে পারে দেশীয় প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও তার বাণিজ্যকরণের মাধ্যমে। কিন্তু তার জন্য সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে বৈজ্ঞানিক মেজাজ তৈরি হওয়া খুবই জরুরি। আর এই ব্যাপারে কাজ শুরু করতে হবে স্কুল কলেজের পড়ুয়াদের নিয়েই। এমন বার্তাই শোনা গেল জাতীয় বিজ্ঞান দিবসে বেথুন কলেজে আয়োজিত বিজ্ঞান দিবস উদযাপনের অনুষ্ঠানে।

ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স অ্যাকাডেমি ও ন্যাশনাল সায়েন্স অ্যাকাডেমির কলকাতা শাখা এবং পিপলস অ্যাসোসিয়েশন ফর সায়েন্স এন্ড এনভায়রনমেন্ট (পেস) যৌথভাবে স্কুল ও কলেজের পড়ুয়াদের নিয়ে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। আলোচনা সভার পাশাপাশি পড়ুয়াদের মধ্যে বিজ্ঞান ও পরিবেশ বিষয়ক পোস্টার তথা তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অমিত কুমার ঘোষ সিভি রমনের জীবনী ও কাজ অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় তুলে ধরেন। দুই বিশিষ্ট বিজ্ঞানী হেমন্ত কুমার মজুমদার ও অশোক কান্তি সান্যাল এবারের বিজ্ঞান দিবসের মূল ভাবনা—'বিকশিত ভারতের জন্য দেশীয় প্রযুক্তি' নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। পড়ুয়াদের মধ্যে বিজ্ঞানের মেজাজ তথা বিজ্ঞান মনস্কতা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন অধ্যাপক সিদ্ধার্থ জোয়ারদার। আলোচনা সভার সূত্রটি বেঁধে দেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী চিত্রা মন্ডল। দিনটির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন অনুষ্ঠানের কো-অর্ডিনেটর সন্দীপ সেন। প্রারম্ভিক ভাষণে 'পেস'-এর কার্যকলাপ তুলে ধরেন সচিব অধ্যাপক প্রদীপ কুমার দাস। সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সৈকত মৈত্র। চ্যাট জিটিপি, মেশিন লার্নিং সহ আধুনিক প্রযুক্তির শালুক সন্ধান দেন তিনি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অধ্যাপক টি এস নাগেশ। ছিলেন বেথুন কলেজের অধ্যক্ষা অণুশিলা হাজরা ভট্টাচার্য, ড.গোরা ঘোষ, ড. জয়শ্রী দাসরায়, অধ্যাপক শুভাশিস বটব্যাল, অধ্যাপক তাপস সর, সুকুমার বেরা, হিমাদ্রী দাস, ড. অরিন্দম ভট্টাচার্য, বিশ্বরূপ দাস প্রমুখ।

নরেন্দ্রপুরে বিদ্যালয় এবং কলেজে জাতীয় বিজ্ঞান দিবস উদযাপন

জাতীয় বিজ্ঞান দিবস উপলক্ষে নরেন্দ্রপুরের রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় গত 28শে ফেব্রুয়ারি ছাত্রদের জন্য একটি বিজ্ঞান বক্তৃতার আয়োজন করেছিলেন। মূলত নবম শ্রেণির ছাত্ররা শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত ছিল। সিটি কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. ভূপতি চক্রবর্তী এই অনুষ্ঠানে মূল বক্তা ছিলেন। তার বক্তৃতার বিষয় ছিল আলো তথা তড়িদচুম্বকীয় রশ্মির বহুমুখী ভূমিকা। তিনি তার আলোচনায় একদিকে আলোক বিজ্ঞানের কিছুটা ইতিহাস ছুঁয়ে আলোচনা করেছেন, অন্যদিকে জানিয়েছেন আলোর ভূমিকা কীভাবে নিছক পদার্থবিদ্যার সীমানা ছাড়িয়ে রসায়ন ও জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। বক্তৃতার গোড়াতে ড. চক্রবর্তী স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামনের নামাঙ্কিত বিখ্যাত পরিঘটনার ঐতিহাসিক তাৎপর্য ছাত্রদের সামনে তুলে ধরেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্বামী ইষ্টেষানন্দ (সন্দীপন মহারাজ) বক্তার সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় করেয়ে দেন। বিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন শিক্ষকও অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

জাতীয় বিজ্ঞান দিবস উপলক্ষে নরেন্দ্রপুরের রামকৃষ্ণ মিশন রেসিদেন্সিয়াল কলেজ (ইউ জি ও পিজি- অটোনমাস) আয়োজিত অনুষ্ঠানেও বক্তা হিসেবে ছিলেন ড. ভূপতি চক্রবর্তী। এখানে তার বলার বিষয় ছিল বোস সংখ্যায়নের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট। কিভাবে পরাধীন ভারতবর্ষের এক প্রতিভাধর তরুণ পদার্থবিদ ঠিক একশো বছর আগে আইনস্টাইনকে তার চিন্তাধারা দিয়ে আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করেছিলেন এবং তার ফলশ্রুতি হিসেবে কিভাবে কোয়ান্টাম সংখ্যায়নের সূচনা ঘটল। মূলত স্নাতক স্তরের পদার্থবিদ্যা ও অন্য বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রদের সাথে উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ স্বামী একচিত্তানন্দ।

ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিক্স টিচার্স এর রিজিওনাল কাউন্সিল 15 এর উদ্যোগে জাতীয় বিজ্ঞান দিবস উদযাপন

গত কয়েক বছরের মতো এবারও ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিক্স টিচার্স (IAPT) এর রিজিওনাল কাউন্সিল 15 (RC15) 28শে ফেব্রুয়ারি, 2024 তারিখে জাতীয় বিজ্ঞান দিবস উদযাপন করে একটি জনপ্রিয় অনলাইন বক্তৃতা আয়োজনের মাধ্যমে। আগের একটি আনুষ্ঠানিক সমীক্ষার ফল এসবের জানা যায়, ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ISRO) দ্বারা গৃহীত প্রকল্পগুলি শোনার জন্য সাধারণ বিজ্ঞানপিপাসু মানুষ এবং শিক্ষার্থীদের গভীর আগ্রহ রয়েছে। এক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুষম মেলবন্ধন মহাকাশ সংক্রান্ত গবেষণায় অত্যাধুনিক উদ্ভাবনের সাথে এমনভাবে জড়িত যা কক্ষপথে উপগ্রহ স্থাপন বা চাঁদের পৃষ্ঠে চন্দ্রযান 3-এর নিরাপদ অবতরণ ও আদিত্য L1 এর মতো মিশন সফল করে তোলে। তাই সংশ্লিষ্ট সকলের আগ্রহের উপকরণ নিয়ে ভারতের কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করেন ডঃ সুভাষচন্দ্র বেরা। ডঃ বেরা ইসরোর স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টারের স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন অ্যান্ড নেভিগেশন সিস্টেম গ্রুপের গ্রুপ ডিরেক্টর। সহযোগী প্রকল্প পরিচালক হিসাবে, তিনি GSAT-31 এবং GSAT-24 যোগাযোগের পেলোডগুলি সফলভাবে স্থাপনে যুক্ত ছিলেন। 1994 সাল থেকে তিনি স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার, ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন (ইসরো)-এর সাথে রয়েছেন, যেখানে তিনি বিভিন্ন ইনস্যাট এবং জিএসএটি সিরিজের যোগাযোগ পেলোড প্রকল্পের পাশাপাশি GAGAN / IRNSS / NavIC পেলোড প্রকল্পের জন্য মাইক্রোওয়েভ সার্কিট এবং সিস্টেমগুলির নকশা ও তাদের বিকাশে যুক্ত ছিলেন। ●

ঐতিহ্যবাহী বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান ভ্রমণ

SCF ও KYN এর যৌথ উদ্যোগে জাতীয় বিজ্ঞান দিবসে সায়েন্স হেরিটেজ ওয়াক আয়োজিত হয়। এবারের গন্তব্যস্থল ছিল জাতীয় শিক্ষা সংসদ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং কাঁচ ও সেরামিক গবেষণা সংস্থা। পাশেই আছে ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স এবং ভারতীয় রাসায়নিক জীববিজ্ঞান সংস্থান। একই জায়গায় এতগুলো নিজ নিজ ক্ষেত্রে উৎকর্ষতার শীর্ষে থাকা উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সমাবেশ এদেশে তো বটেই বিদেশেও খুব বেশি দেখা যায় না। প্রাথমিকভাবে এই চারটি জায়গায় যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও দুর্ভাগ্যের বিষয় প্রশাসনিক কারণে শেষোক্ত দুটি বিজ্ঞানকেন্দ্রে যাওয়ার অনুমতি পাওয়া যায় নি, এই ভ্রমণ প্রথম তিনটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রায় 50 জন বিজ্ঞানবন্ধু এই ভ্রমণে অংশ নেন। 1906 সালে বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী ও শিক্ষাবিদ সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় 'জাতীয় শিক্ষা সংসদ'। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে দেশ জুড়ে ইংরেজ প্রভাবিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ছেড়ে বেরিয়ে আসছে হাজার হাজার দেশপ্রেমিক মেধাবী ছাত্র ছাত্রীরা। ভবিষ্যতে তাদের শিক্ষার নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখার স্বার্থে, সেইসঙ্গে দেশীয় প্রয়োজনে দেশীয় শিল্পের বিকাশ ঘটানোর উপযোগী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার প্রসার ঘটাতে গঠিত হয় National College ও Bengal Technical Institution। এই ঐতিহ্যশালী প্রতিষ্ঠান যার সঙ্গে দীর্ঘ দিন সক্রিয় ভাবে যুক্ত ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের মত আরও অনেক স্বনামধন্য ব্যাক্তিবর্গ। 1955 সালে মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধান চন্দ্র রায়ের উদ্দোগে স্বনামধন্য এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আত্মপ্রকাশ করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। অপর একটি বিখ্যাত গবেষণা প্রতিষ্ঠান হলো কেন্দ্রীয় কাঁচ ও সেরামিক গবেষণা সংস্থা। 1950 সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থা বৈজ্ঞানিক ও ঔদ্যোগীক অনুসন্ধান পরিষদ (CSIR)-এর প্রথম চারটি গবেষণাগারের একটি। কাঁচ ও সিরামিক শিল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা ও শিল্প-সহযোগী সমস্যা সমাধানে এই প্রতিষ্ঠান পথিকৃৎ। সাথে সাথে উচ্চ বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতিষ্ঠান হিসাবেও এর সুনাম বহুবিস্তৃত। SCF পূর্বেও এই ধরণের বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান ভ্রমণের আয়োজন করেছে। পরিকল্পনা আছে, ভবিষ্যতেও আরো এরকম প্রতিষ্ঠান ঘুরে দেখার সুযোগ করে দেবে। ●

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জগতের এপ্রিল মাসের কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা

SN 1006 সুপারনোভা দেখা

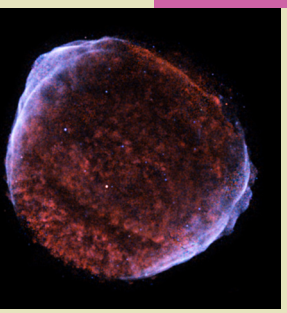

SN 1006 একটি সুপারনোভা যা সম্ভবত মহাকাশবিজ্ঞানের ইতিহাসে পর্যবেক্ষণ করা সবচেয়ে উজ্জ্বল নাক্ষত্রিক ঘটনা। এর উজ্জ্বলতা শুক্রের উজ্জ্বলতার প্রায় ষোল গুণ বেশি। 1006 সালের 30 এপ্রিল থেকে 1 মে-র মধ্যে লুপাসের নক্ষত্রমণ্ডলে উপস্থিত হওয়া এই "অতিথি তারকা" চীন, জাপান, আধুনিক ইরাক, মিশর এবং ইউরোপ জুড়ে পর্যবেক্ষকদের দৃষ্টিতে ধরা পরে। অনেক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে এটি দিনের বেলায়ও স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান ছিল। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে এখন পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব প্রায় 7,200 আলোকবর্ষ। মিশরীয় জ্যোতিষী এবং জ্যোতির্বিদ আলী ইবনে রিদওয়ান এ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন যে "জ্যোতিস্কটি ছিল বড় এবং বৃত্তাকার, এটি ছিল শুক্রের চেয়ে 2.5 থেকে 3 গুণ বড়। এর আলোর কারণে আকাশ জ্বলজ্বল করছিল। এর আলোর তীব্রতা এর আলো ছিল চাঁদের আলোর এক চতুর্থাংশের চেয়ে কিছু বেশি"। কিছু জ্যোতিষী এই ঘটনাটিকে প্লেগ এবং দুর্ভিক্ষের পূর্বাভাস হিসাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। দ্য বুক অফ হিলিং-এ, ইরানী দার্শনিক ইবনে সিনা উত্তর-পূর্ব ইরান থেকে এই সুপারনোভা পর্যবেক্ষণের কথা জানিয়েছেন। তিনি এটিকে একটি ক্ষণস্থায়ী মহাকাশীয় বস্তু হিসেবে বর্ণনা করেছেন যা ছিল স্থির এবং লেজবিহীন। এটি প্রায় 3 মাস ধরে ক্রমশ ম্লান হতে থাকে এবং এটি স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করে অদৃশ্য হয়ে যায়। এটি ছিল চকচকে এবং খুব উজ্জ্বল, এবং সময়ের সাথে সাথে এর রঙ পরিবর্তিত হয়। সং রাজবংশের সরকারী ইতিহাস সোংশির মতে ওই বছর 1 মে তারিখে দেখা এই নক্ষত্রটি লুপাস এবং সেন্টোরাসের মধ্যে ডি নক্ষত্রমণ্ডলের দক্ষিণে আবির্ভূত হয়েছিল। এটি এত উজ্জ্বলভাবে জ্বলছিল যে রাতে এর আলোয় পৃথিবীপৃষ্ঠ দৃশ্যমান হয়ে উঠেছিল।

প্রথম পাস্তুরীকরণ

ফরাসি জীববিজ্ঞানী, মাইক্রোবায়োলজিস্ট এবং রসায়নবিদ লুই পাস্তুর 1862 সালের 20 এপ্রিল প্রথম সফল খাদ্য সংরক্ষণ পরীক্ষা সম্পন্ন করেন, পেটেন্ট প্রাপ্তির পর বর্তমানে এই পদ্ধতিটিকে আমরা পাস্তুরাইজেশন হিসাবে জানি । 1880-এর দশকে পাস্তুরের গবেষণা প্রমাণ করেছিল যে, খাদ্য পচনের জন্য দায়ী অণুজীব এবং দূষণ ছাড়া অণুজীবগুলি বিকশিত হতে পারে না। ওয়াইন নিয়ে পরীক্ষা করে তিনি দেখিয়েছিলেন যে তাপ প্রয়োগে জীবাণুমুক্ত প্রক্রিয়াকরণ এবং সিল করা ফ্লাস্কে রক্ষিত ওয়াইন অবাঞ্ছিত অণুজীবকে নিষ্ক্রিয় করে দেবে, কিন্তু বায়ুর সংস্পর্শে আসলেই অণুজীবের আবার সক্রিয় হয়ে উঠবে। জীবাণু এবং ওয়াইন নিয়ে পাস্তুরের পরীক্ষায় ব্যাকটেরিয়া এবং ওয়াইন টক হওয়ার মধ্যে সরাসরি কার্য-কারণ সম্পর্ক প্রকাশ পায়। পরবর্তীকালে, তিনি এমন একটি প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেন যার মাধ্যমে ওয়াইনকে 60 থেকে 100 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে উত্তপ্ত করে ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলা যায়, তারপরে এটিকে ঠান্ডা করা যায়। এই প্রক্রিয়া বিয়ার, ফলের রস, ডিম এবং দুধে প্রয়োগ করা হয়েছিল। খাদ্যের পাস্তুরীকরণের তাপমাত্রা এবং সময় খাদ্যের অম্লতা দ্বারা নির্ধারিত হয়। ফলের রস জাতীয় বেশি অম্লধর্মী খাবারে ($pH < 4.6$) তাপ প্রয়োগ করে এনজাইমগুলিকে নিষ্ক্রিয় করা হয় এবং ঈস্ট এবং ল্যাকটোব্যাসিলাসকে ধ্বংস করা হয়। দুধ জাতীয় কম অম্লধর্মী খাবারে ($pH > 4.6$) তাপ প্রয়োগের মাধ্যমে খাদ্যে উপস্থিত অণুজীব এবং সেইসাথে ঈস্ট ধ্বংস করা হয়। উভয় প্রক্রিয়াই শীতলীকরণের মাধ্যমে খাদ্যের সংরক্ষণকাল দীর্ঘায়িত করে।

আর্লি বার্ড—প্রথম বাণিজ্যিক যোগাযোগ উপগ্রহ

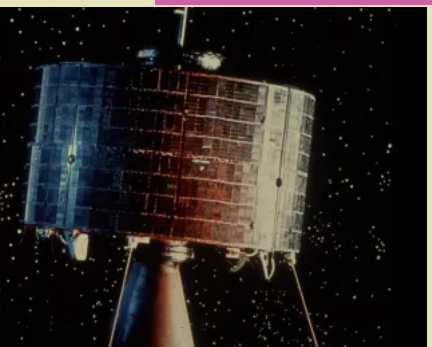

ইন্টেলস্যাট-1 ছিল প্রথম বাণিজ্যিক যোগাযোগ উপগ্রহ যা জিওসিঙ্ক্রোনাস কক্ষপথে স্থাপন করা হয়েছিল 1965 সালের 6 এপ্রিল তারিখে। উপগ্রহটি আর্লি বার্ড নামে বেশি জনপ্রিয় ছিল। এটি হিউজেস এয়ারক্রাফ্ট কোম্পানির স্পেস অ্যান্ড কমিউনিকেশনস গ্রুপ (পরে হিউজেস স্পেস অ্যান্ড কমিউনিকেশন্স কোম্পানি, এবং বর্তমানে বোয়িং স্যাটেলাইট সিস্টেম) দ্বারা COMSAT-এর জন্য নির্মিত হয়েছিল। এটিকে সক্রিয় করা হয়েছিল 1965 সালের 28 জুন তারিখে। এটি আটলান্টিক

মহাসাগরের উপরে 28° পশ্চিম দ্রাঘিমাংশে তার জিওসিঙ্ক্রোনাস অরবিটাল অবস্থানে পৌঁছেছিল, যেখানে এটি পরিষেবায় রাখা হয়েছিল। প্রথম ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার মধ্যে সরাসরি এবং প্রায় তাৎক্ষণিক যোগাযোগ, টেলিভিশন, টেলিফোন এবং টেলিফ্যাকসিমিলি ট্রান্সমিশন পরিচালনার পথিকৃৎ আর্লি বার্ড স্যাটেলাইট। 1965 সালের ডিসেম্বরে জেমিনি 6 মহাকাশযানের সমুদ্র-অবতরণ প্রথম সরাসরি টিভি কভারেজ করে এই উপগ্রহটি। মূলত 18 মাস কাজ করার জন্য নির্ধারিত থাকলেও আর্লি বার্ড 4 বছর এবং 4 মাস ধরে সক্রিয় পরিষেবায় ছিল এবং 1969 সালের জানুয়ারীতে এটিকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়। যদিও এটি আটলান্টিক ইন্টেলস্যাট স্যাটেলাইট ব্যর্থ হলে অ্যাপোলো 11 ফ্লাইট পরিবেশন করার জন্য সেই বছরের জুনে সাময়িকভাবে সক্রিয় করা হয়েছিল, 1969 সালের আগস্টে এটি আবার নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়। তবে এটি এখনো কক্ষপথেই রয়ে গেছে। ●

প্রথম কাইনেটোস্কোপের মাধ্যমে চলচ্চিত্র প্রদর্শন

কাইনেটোস্কোপ হল একটি প্রারম্ভিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী যন্ত্র, যাতে একটি ছিদ্রের মাধ্যমে একবারে একজন ব্যক্তি চলচ্চিত্র দেখতে পারেন। এতে একটি আলোর উৎসের উপর ছিদ্রযুক্ত ফিল্মের একটি স্ট্রিপ দ্রুত চালিয়ে অনুক্রমিক চিত্রশ্রেণীকে চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়েছিল। 1888 সালে মার্কিন উদ্ভাবক টমাস আলভা এডিসন প্রথম এই যন্ত্রের ধারণা দিলেও এটি মূলত তার কর্মচারী উইলিয়াম কেনেডি লরি ডিকসন দ্বারা 1889 এবং 1892 সালের মধ্যে তৈরি করা হয়েছিল। 1891 সালের 20 মে এডিসন পরীক্ষাগারে আমন্ত্রিত ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ উইমেনস ক্লাবের সদস্যদের কাছে একটি কাইনেটোস্কোপ প্রোটোটাইপ প্রথম প্রদর্শন করা হয়েছিল। সম্পূর্ণ সংস্করণটি দুই বছর পরে ব্রুকলিনে সার্বজনীনভাবে উন্মোচন করা হয়েছিল, এবং 1894 সালের 14 এপ্রিল প্রথম বাণিজ্যিক প্রদর্শনী হয়। দশটি কাইনেটোস্কোপ ব্যবহার করে নিউ ইয়র্ক সিটিতে চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়েছিল। আমেরিকান চলচ্চিত্র সংস্কৃতির পুরোধা এই যন্ত্র ইউরোপেও একটি বড় প্রভাব ফেলেছিল। এডিসনের এই যন্ত্রের আন্তর্জাতিক পেটেন্ট না নেওয়ার সিদ্ধান্তের ফলে বিদেশে এর প্রভাব বৃদ্ধি পায়, যা প্রযুক্তির অসংখ্য অনুকরণ এবং উন্নতির সহায়ক হয়েছিল। এডিসন প্রাথমিকভাবে এই যন্ত্রটিকে আর্থিকভাবে অলাভজনক বলে মনে করেছিলেন, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই এই যন্ত্র ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। পরবর্তী সময়ে এডিসনের ফার্ম দ্বারা নির্মিত অসংখ্য মোশন পিকচার সিস্টেম প্রজেক্টিং কাইনেটোস্কোপ নামে বাজারজাত করা হয়। ●

প্রথম সেলফোনে বার্তালাপ

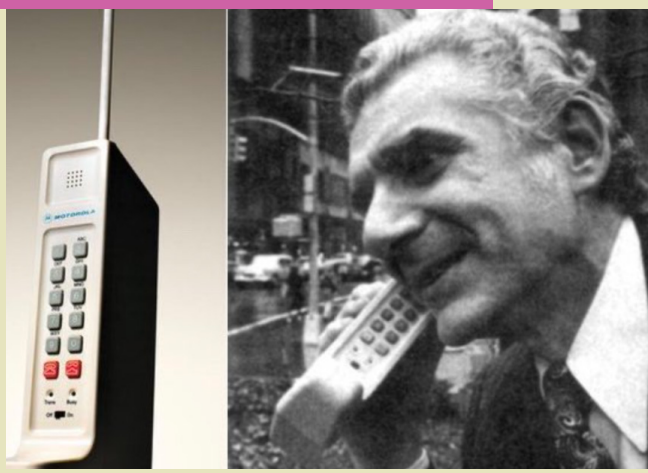

1973 সালের 3 এপ্রিল ম্যানহাটনের সিক্সথ অ্যাভিনিউয়ের একটি ফুটপাতে দাঁড়িয়ে মটোরোলা কোম্পানির গবেষক প্রকৌশলী মার্টিন কুপার প্রায় ইটের আকারের একটি যন্ত্র নিয়ে তার অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী AT&T-মালিকানাধীন বেল ল্যাবসের প্রধান জোয়েল এঙ্গেলকে ফোনে বলেন, "আমি আপনাকে একটি সেল ফোনে কল করছি, এবং এটি একটি ব্যক্তিগত ব্যবহারযোগ্য হাতে ধরা বহনযোগ্য আসল সেল ফোন।" এটিই ছিল সেল ফোন থেকে প্রথম সর্বজনীন ফোনকল। সেদিন ঐসময় রাস্তায় যারা কুপারের সাথে উপস্থিত ছিলেন, তারা এক ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী হয়ে রইলেন। পরবর্তী পাঁচ দশকে বহু পরিবর্তন ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির মধ্যে দিয়ে আজকের হালকা, পাতলা এবং দ্রুত কার্যকর সেলফোন আমাদের হাতে পৌঁছেছে। এই যন্ত্রটি এখন সর্বব্যাপী এবং আমাদের নিত্য জীবনের অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী। কুপার বলেছিলেন যে মোবাইল ফোনগুলি একদিন মানবজাতির জন্য অপরিহার্য বলে মনে করা হবে এবং তা শুরু থেকেই স্পষ্ট ছিল। বর্তমানে 94 বছর বয়স্ক কুপার তার এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, আজ প্রায় সবার কাছেই সেলফোন আছে এতে অবাক হবার কিছু নেই, হয়তো অদূর ভবিষ্যতে এমন একদিন আসবে যেদিন শিশু জন্মগ্রহণ করার সাথেসাথেই তার জন্য একটি সেলফোন নম্বর বরাদ্দ করা হবে। কুপারের ঐতিহাসিক প্রথম সেলফোন ব্যবহারের পর উৎপাদন সমস্যা এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণের কারণে এর ব্যবসায়িক উৎপাদন ও জনসাধারণের ব্যবহারের সূচনায় লাগে যায় প্রায় আরো একটি দশক। সেসময় যে সেলফোন প্রচলিত ছিল, সেগুলি ছিল প্রতি এক ফুট লম্বা এবং সেগুলির ওজন ছিল এক কিলোগ্রামেরও বেশি। দাম পড়তো এক লক্ষ টাকারও কিছু বেশি। ●

এপ্রিলে জন্মগ্রহণ করেছেন যে বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা

সোফি জারমেইন

1776-সালের পয়লা এপ্রিল প্যারিসে এই গণিতবিদ ও পদার্থবিজ্ঞানীর জন্ম হয়। তবে একজন নারী হিসেবে বিজ্ঞানের আঙিনায় পা রাখার জন্য ইওরোপেও সময়টা একেবারেই ঠিক ছিল না। তার গণিতে আগ্রহ তৈরি হয় তারা বাবার লাইব্রেরিতে রাখা গণিতবিদ লিওনার্ড অয়লারের বই পাঠ করে। তারপর তিনি বিখ্যাত ফরাসী ও জার্মান গণিতবিদদের সঙ্গে চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ শুরু করেন। তবে লাগ্রাঞ্জ, লেজেন্ডার বা গাউসকে লেখা সেইসব চিঠিতেও তার নারী পরিচয় গোপন রাখতে হয়েছিল, সেখানে তিনি ছিলেন মঁসিয়ে ল্যব্ল্যঁক্ষ। প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চ শিক্ষার দরজা সেই সময় তার জন্য খোলে নি, তিনি একেবারে নিজের প্রচেষ্টায় স্বাধীনভাবে কাজ করে গেছেন এবং এইভাবে তিনি পদার্থবিদ্যার স্থিতিস্থাপকতার তত্ত্ব তুলে এনেছেন, কাজ করেছেন ফার্মার শেষ উপপাদ্য নিয়ে। তিনি ছিলেন স্থিতিস্থাপকতা তত্ত্বের অন্যতম পথিকৃৎ, এবং এই বিষয়ে তার প্রবন্ধের জন্য প্যারিস একাডেমি অফ সায়েন্সেস থেকে গ্র্যান্ড পুরস্কার লাভ করেন। তার মৃত্যুর অল্প আগে গাউস তাকে প্রথাগত ডিগ্রী দেওয়ার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু তা ফলপ্রসূ হয় নি। ●

আগাস্ট উইলহেলম ভন হফম্যান

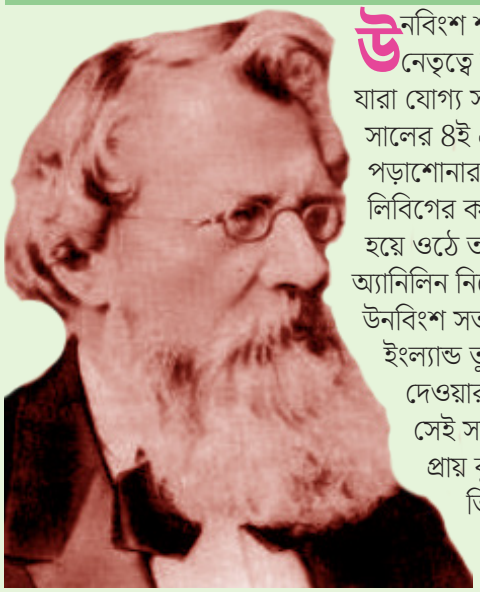

উনবিংশ শতকে রসায়নবিদ্যা চর্চায় জার্মানিকে বিশ্বের সেরা গন্তব্য যারা করে তুলেছিলেন তাদের নেতৃত্বে ছিলেন জাস্তাস ভন লিবিগ, রবার্ট বুনসেন মত দিকপালেরা। এই বিজ্ঞানীদের সঙ্গে যারা যোগ্য সঙ্গত করে গেছেন তাদের অন্যতম ছিলেন আগাস্ট উইলহেলম ভন হফম্যান। 1818 সালের 8ই এপ্রিল জার্মানিতে জন্ম হফম্যানের। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে প্রথমে আইন ও দর্শন নিয়ে পড়াশোনার ইচ্ছে থাকলেও ঐ গ্লেসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক-গবেষক জাস্টাস ভন লিবিগের কাজে বিশেষ আকৃষ্ট হয়ে রসায়নবিদ্যা চর্চার দিকে ঝুঁকে পড়েন। ক্রমে জৈব রসায়ন হয়ে ওঠে তার প্রিয় ক্ষেত্র। 1841 সালে তিনি লিবিগের অধীনে পিএইচ ডি সম্পূর্ণ করেন। অ্যানিলিন নিয়ে তার গবেষণার ফলাফল অ্যানিলিন নির্ভর রঞ্জকের শিল্প গড়ে উঠতে সাহায্য করে। উনবিংশ সতকের মধ্যভাগে ইংল্যান্ডের রাজ পরিবার ও প্রশাসকেরা অনুভব করেন যে রসায়নে ইংল্যান্ড তুলনায় পিছিয়ে পড়ছে। ইংল্যান্ডে ফলিত রসায়ন চর্চার এক কেন্দ্র গড়ে তোলার নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য লন্ডনের রয়েল সোসাইটি জার্মান রসায়নবিদ লিবিগকে অনুরোধ করে। লিবিগ সেই সময় এই কাজের জন্য হফম্যানের নাম প্রস্তাব করেন। এর ফলে হফম্যান 1845 থেকে প্রায় কুড়ি বছর ইংল্যান্ড অতিবাহিত করেন, গড়ে ওঠে রয়েল কলেজ অব কেমিস্ট্রি। পরে তিনি জার্মানিতে ফিরে গিয়ে তার গবেষণাকাজ চালিয়ে যান। তার মৃত্যুর পরে জার্মান কেমিক্যাল সোসাইটি বিশ্বের প্রথম সারির রসায়নবিদদের স্বীকৃতি দেওয়ার উদ্দেশ্যে তার নামাঙ্কিত একটি পদক চালু করে। ●

লিওনার্ড অয়লার

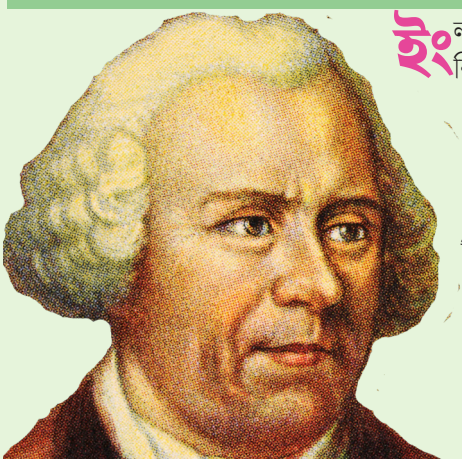

ইংল্যান্ডে যখন প্রবীণ নিউটন তার বিজ্ঞান ও গণিতের জগত থেকে সরে এসে ধর্মতত্ত্ব নিয়ে লেখালেখি করার বিষয়ে মন দিয়েছেন সে সময় 1707 সালের 15ই এপ্রিল সুইজারল্যান্ডে জন্ম গ্রহণ করেন লিওনার্ড অয়লার। আধিনিক যুগের একজন গণিতবিদ হিসেবে অয়লারের স্থান খুবই উঁচুতে। তার চিন্তার মধ্যে দিয়ে গণিতের জগতে যেসব ধ্যান-ধারণা জায়গা করে নিয়েছে তিন'শ বছর পরেও সেগুলির ব্যবহার বেড়েই চলেছে। সবথেকে বড় কথা তার অবদান কেবল গণিতবিদদের দিশা দেখায়নি, তার কাজের অবদান রয়েছে বহু প্রায়োগিক ক্ষেত্রে। তার অনেক

অবদানের একটি হচ্ছে যে এক্সপোনেনশিয়াল বা e যাকে স্বভাবিক লগারিদমের base বা ভূমি বলা যায় তার তাৎপর্য তুলে ধরা। এখন আমরা e কে অয়লার সংখ্যা হিসেবেও উল্লেখ করি। আমরা জানি যা কোন তেজস্ক্রিয় কেন্দ্রকের ভাঙ্গনের হার প্রকাশ করতে বা কোন অঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আলোচনার জন্য এই e-এর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। অয়লার অবশয কেবল গণিতের জগতেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। তিনি তার প্রতিভার ছাপ রেখেছেন বলবিদ্যা, প্রবাহী গতিবিদ্যা, আলোক বিজ্ঞান, জ্যোর্তিবিদ্যা প্রভৃতি নানা শাখায়। আমাদের এখনকার ব্যবহৃত অনেকগুলি গাণিতিক চিহ্ন তারই প্রস্তাবনা, এবং এখন সেগুলি প্রামাণ্য চিহ্ন হিসেবে সকলেই ব্যবহার করছেন। যেমন -1 এর বর্গমূলকে i দিয়ে সূচিত করা বা ত্রিভুজের পার্শ্বগুলি ইংরাজি ছোট হাতের ও কোণগুলি ইংরাজি বড় হাতের অক্ষর দিয়ে সূচিত করা প্রভৃতি তার অবদানের অন্যতম।

জে রবার্ট ওপেনহাইমার

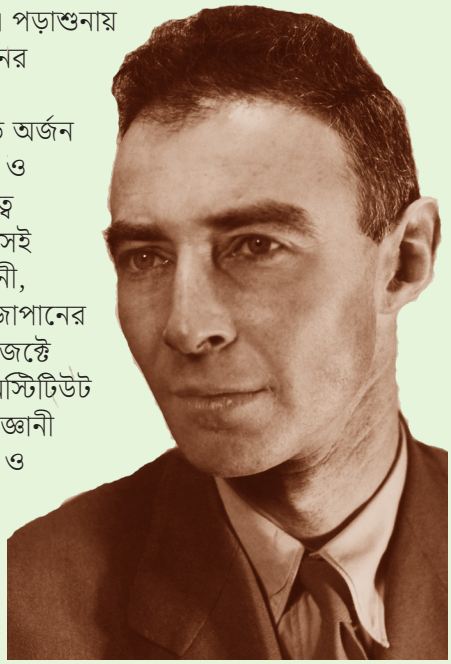

1904 সালের 22শে এপ্রিল নিউ ইয়র্ক শহরে জে রবার্ট ওপেনহাইমারের জন্ম হয়। পড়াশুনায় তিনি ছিলেন একেবার প্রথম সারির ছাত্র। তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নের স্নাতক হলেও তার প্রকৃত আকর্ষণ ছিল তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার দিকে। তিনি জার্মানিতে গটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাত্র তেইশ বছর বয়সে ম্যাক্স বর্নের অধীনে পিএইচ ডি অর্জন করেন। তাত্ত্বিক পদার্থবিদ হওয়া সত্ত্বেও তার পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন শাখায় ব্যাপক জ্ঞান ও নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতার জন্য তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পারমাণবিক বোমা তৈরি করার প্রকল্প ম্যানহাটন প্রজেক্ট-এর পরিচালক নিযুক্ত হন। সেই প্রকল্পে কেবল আমেরিকা নয় ইওরোপের নানা দেশের প্রথম সারির গবেষক ও বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ ও আরও কিছু শাখার দক্ষ কর্মীরা যুক্ত হন। 1945 সালের আগস্ট মাসে জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে যে দুটি পারমাণবিক বোমা ফেলা হয় তা এই ম্যানহাটন প্রজেক্টে নির্মিত হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে 1947 সালে তিনি প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড স্টাডিজ এর অধিকর্তা নিযুক্ত হন, এবং তখন সেখানে এক বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী হিসেবে কাজ করছেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। পঞ্চাশের দশকে যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে সম্পর্কের চূড়ান্ত অবনতি ঘটে, সেই সময় ওপেনহাইমারের বেশ কিছু ক্ষমতা খর্ব করা হয়, কারণ তার ভাই একসময় আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টির ঘনিষ্ট ছিলেন এবং ওপেনহাইমার ঐ পার্টির আরও কিছু সদস্যের সঙ্গে ঘনিষ্ট ছিলেন। তার মৃত্যুর অনেক পরে অবশ্য তার বিরুদ্ধে থাকা অভিযোগগুলি থেকে তাকে অব্যহতি দেওয়া হয়।

চার্লস রিখটার

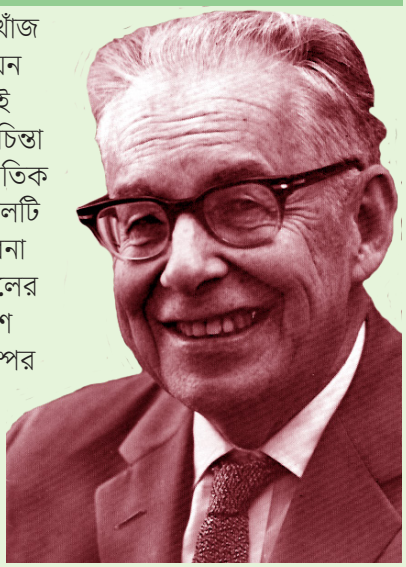

পৃথিবীর যে কোন জায়গায় ভূমিকম্পের কথা সংবাদ মাধ্যমে পরিবেশিত হলে আমারা খোঁজ করি এই রিখটার সাহেবের দেওয়া একটা স্কেলের, যেখানে একটা সংখ্যা আমাদের যেন বুঝতে সাহায্য করে কতটা শক্তিশালী ছিল সেই ভূকম্পন। আমরা এখন জেনে গেছি যে ওই স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা 2 বা 3 থাকলে সেটা তেমন জোরালো নয়, কিন্তু তার বেশি হলে চিন্তা রয়েছে। যে অঞ্চলে ভূমিকম্প হয়েছে সেখানকার জনঘনত্ব, ও সেখানকার মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা বুঝতে সাহায্য করে এই ভূমিকম্পের ফলে ক্ষয়ক্ষতি কতটা হতে পারে। আর এই স্কেলটি 1935 সালে ক্যালিফোর্নিয়া ইনসটিটিউট অফ টেকনোলজির অধ্যাপক চার্লস রিক্টার উদ্ভাবনা করেছিলেন আর এক বিজ্ঞানীর সঙ্গে যৌথভাবে। তার নাম বেনো গুটেনবার্গ। তাই এই স্কেলের প্রকৃত নাম ছিল রিখটার-গুটেনবার্গ স্কেল। ভূকম্পনবিদ চার্লস রিখটার 1900 সালের 26শে এপ্রিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওহাইয়ো রাজ্যে জন্মগ্রহণ করে। এখন অবশ্য এই স্কেল ভূমিকম্পের মাত্রা বিচারের জন্য ব্যবহৃত হয় না। 1979 সালের পর থেকেই সেখানে এসে গেছে মোমেন্ট ম্যাগনিটিউড স্কেল। তবে রিখটার সাহেব তার স্কেলের জন্য এতটাই পরিচিতি লাভ করেছিলেন যে এখনও রিখটার স্কেলকেই বেশি চেনা মনে হয়। 1941 সালে তার গুটেনবার্গের সাথে যৌথ প্রকাশনা “সিসমসিটি অফ দ্য আর্থ” এবং 1958 সালে একক প্রকাশনা “এলিমেন্টারি সিসমোলজি” বই দুটি আজও বিজ্ঞানীমহলে সমাদৃত।

গ্রন্থ সমালোচনা

ক্যান্সার
একটি রহস্যময় জগৎ

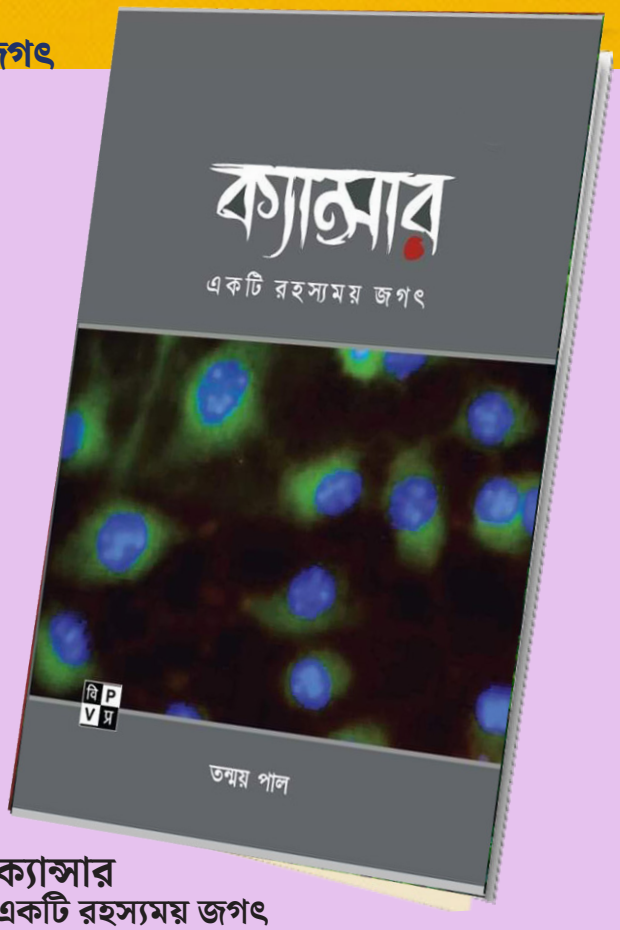

ক্যান্সার
একটি রহস্যময় জগৎ
লেখকঃ তন্ময় পাল
ISBN: 978-81-7480-356-6
পৃষ্ঠা: 80 | মূল্য: 100.00

কর্কট রোগের ইতিহাসের ব্যক্তি সুপ্রাচীন কাল থেকেই। প্রায় 7–8 কোটি বছর আগের ডাইনোসরের জীবাশ্ম সন্ধান মিলেছে কর্কটক্রান্ত কোষের। এরপরেও মানব বিবর্তনের সরণি বেয়ে চলতে থাকলে দেখা যাবে আদিম মানব অস্ট্রালোপিথেকাস হোক কিংবা খ্রিস্টপূর্ব 3000-এর মিশরীয় মমি, কর্কট রোগের হদিশ মিলেছে এদের মধ্যেও। প্রায় 400 খ্রিস্টপূর্বে গ্রিক চিকিৎসক বিজ্ঞানী হিপোক্রেটিস নানাবিধ কর্কট রোগ এবং তাদের লক্ষণগুলিকে একত্রে 'কার্সিনোস' অর্থাৎ কাঁকড়া নামে আখ্যায়িত করেন। এরপর বিজ্ঞানের অগ্রগতির রথের সওয়ার হয়ে মানুষ কর্কট রোগের বহুমুখী আঙ্গিকগুলি খুঁজে বেরিয়েছে। ক্যান্সার কোষ থেকে শুরু করে রোগ হওয়ার কারণ এবং তার চিকিৎসাপদ্ধতি—এইসব সম্পর্কে বহু তথ্য আজ আমাদের কাছে সহজলভ্য হলেও কিছু প্রশ্নের উত্তর আজও অজানা। এইসব তথ্য ও গবেষণা বই আকারে প্রকাশিত হয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন ও বিজ্ঞানমনস্ক করে তুলছে বহুকাল ধরে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এমন বই সংখ্যায় কম এবং অপ্রতুল। এই জনবিজ্ঞানমূলক ঘাটতি পূরণ করতে এগিয়ে এসেছেন অধ্যাপক ডঃ তন্ময় পাল মহাশয়। বিজ্ঞান প্রসার দ্বারা সম্পাদিত "ক্যান্সারঃ একটি রহস্যময় জগৎ" নামের তার এই বইটি এক কথায় অতীব প্রাঞ্জল ভঙ্গিতে লেখা। মাত্র দশটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের অধ্যায় নিয়ে লেখা এই বইটিতে ক্যান্সার এবং তার প্রকারভেদ সম্পর্কে বলা হয়েছে। শরীরের কোষে কোষে ক্যান্সার কিভাবে আগ্রাসী ভাবে ছড়িয়ে পড়ে তাও উল্লেখ করা হয়েছে এই বইয়ে। জিনের সাথে ক্যান্সারের অশুভ আঁতাত বা অঙ্কোজিনের আণবিক বিকৃতি ও বিপথগামীতা কিভাবে ক্যান্সারকে ডেকে আনে তা নিয়েও লেখক বিবৃতি দিয়েছেন।

ক্যান্সাররোগের বহুস্তরীয় উৎপত্তি এবং টিউমারের জন্য প্রয়োজনীয় আদর্শ অণুপরিবেশের কথাও বলা হয়েছে এখানে। পাশাপাশি লেখক ব্যাখ্যা করেছেন কর্কট রোগের চিকিৎসার অন্যতম অন্তরায় মেটাস্টেসিসকে নিয়ে। ক্যান্সার কোষের দেহের স্বাভাবিক অনাক্রম্যতাকে ফাঁকি দেওয়া অথবা তার বিবর্তনের পদ্ধতিগুলি সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ডঃ পাল। বইটির শেষ ভাগে ক্যান্সারের চিকিৎসা নিয়ে নানাবিধ বিষয় বিবৃত হয়েছে যা জনবিজ্ঞানের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। বইয়ের শেষে লেখকের দেয়া প্রয়োজনীয় পুস্তক তালিকাটি সবাইকে সমৃদ্ধ করবে। এক কথায় 'ক্যান্সারঃ একটি রহস্যময় জগৎ' বইটি সঙ্গত কারণেই একটি ক্যান্সার বিষয়ক জ্ঞান সোপানের বীজতলা যা হয়তো সব স্তরের মানুষ এবং সর্বোপরি পড়ুয়াদের ক্ষেত্রে একটি নতুন জানালা খুলে দেবে। বিজ্ঞানভিত্তিক কারণে বইতে ডঃ পাল যে ছবিগুলি ব্যবহার করেছেন তা বইটিকে আরো সুপাঠ্য করে তুলেছে। তবে প্রকাশকের কাছে অনুরোধ রইলো পরবর্তী সংস্করণে যদি চিত্রগুলিকে রঙিন করা যায়। ●

ডঃ অরুনাভ মুখার্জী
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ,
রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়, রহড়া

লেখকদের জন্য: বাংলা বিজ্ঞান কথায় অনধিক 1200 শব্দের মধ্যে বাংলায় লোকবিজ্ঞান প্রবন্ধ, বিজ্ঞানের গল্প, কল্পবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে লেখা পাঠানোর জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। হাতে লেখা বা ইউনিকোড ফন্টে টাইপ করা পাণ্ডুলিপি এবং পৃথকভাবে লেখা সংক্রান্ত ছবি পাঠানোর জন্য Bangla Bigyan Katha, Shanti Foundation, UG 17, Jyoti Shikhar, District Centre, Janakpuri, New Delhi 110060 ঠিকানায় চিঠি পাঠান বা ইমেল করুন: amitesh@sunpublish.com. প্রতিটি লেখার শেষে অবশ্যই লেখক পরিচিতি ও লেখকের ইমেল উল্লেখ করুন।